৪র্থ পারা

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

(৯২) তোমরা কখনও পুণ্য[১] লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।[২]

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٣)

(৯৩) তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইস্রাঈল নিজের জন্য যা অবৈধ করেছিল, তা ব্যতীত বনী ইস্রাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই বৈধ ছিল। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তওরাত আন এবং তা পাঠ কর।'[৩]

فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩٤)

(৯৪) এরপরও যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তারাই অত্যাচারী।

قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٩٥)

(৯৫) বল, আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর এবং সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (٩٦)

(৯৬) নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা বক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত।[৪] তা বর্কতময় ও বিশ্বজগতের জন্য পথের দিশারী।

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً

(৯৭) ওতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন) মাক□ামে ইব্রাহীম

---

(১) 'পুণ্য' বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে, সৎকাজ অথবা জান্নাত। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* হাদীসে বর্ণিত যে, যখন এই আয়াত নাযিল হয়, তখন আবূ ত্বালহা আনসারী ﷺ --যিনি মদীনার বিশিষ্ট সাহাবীদের একজন -- নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! বাইরুহা বাগানটি হল আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। সেটাকে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাদক্বা করছি। রসূল ﷺ বললেন, "সে তো বড়ই উপকারী সম্পদ। আমার মত হল, ওটাকে তুমি তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও।" তাই রসূল ﷺ-এর পরামর্শ অনুযায়ী সেটাকে তিনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজন এবং চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন ক'রে দিলেন। *(মুসনাদ আহমাদ)* এইভাবে আরো অনেক সাহাবী তাঁদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন। مِمَّا تُحِبُّونَ এ 'মিন' (হতে) শব্দ 'তাবঈয' তথা কিয়দংশ বুঝানোর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, পছন্দনীয় ও প্রিয় জিনিসের সবটাকেই ব্যয় ক'রে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং তা থেকে কিয়দংশকে ব্যয় করতে বলা হয়েছে। কাজেই সাদক্বা করলে ভাল জিনিসই করা উচিত। এটা হল সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করার তরীকা। তবে এর অর্থ এও নয় যে, নিম্নমানের জিনিস অথবা স্বীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস কিংবা ব্যবহৃত পুরাতন জিনিস সাদক্বা করা যাবে না বা তার নেকী পাওয়া যাবে না। এই ধরনের জিনিসও সাদক্বা করা জায়েয এবং তাতে নেকী অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে বেশী ফযীলত ও পূর্ণতা রয়েছে প্রিয় বস্তু ব্যয় করার মধ্যে।

(২) ভাল ও মন্দ যে জিনিসই তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন সেই অনুযায়ী প্রতিদানও তিনি দিবেন।

(৩) এই আয়াত এবং পরের দু'টি আয়াত ইয়াহুদীদের অভিযোগের খন্ডনে অবতীর্ণ হয়। তারা নবী করীম ﷺ-কে বলল যে, তুমি নিজেকে ইব্রাহীম ﷺ-এর দ্বীনের অনুসারী বলে দাবী কর এবং তুমি উটের গোশ্ত খাও; অথচ ইব্রাহীমের দ্বীনে উটের গোশ্ত এবং তার দুধ হারাম ছিল। মহান আল্লাহ বললেন, ইয়াহুদীদের এ অভিযোগ ভুল ও ভিত্তিহীন। কারণ, ইব্রাহীম ﷺ-এর দ্বীনে এ জিনিসগুলো হারাম ছিল না। তবে হ্যাঁ কোন কোন জিনিস ইসরাঈল (ইয়াকুব) ﷺ নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। আর তা ছিল এই উটের গোশ্ত এবং তার দুধ। (তার কারণ ছিল মানত অথবা রোগ)। আর ইয়াকুব ﷺ-এর এ কাজও ছিল তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বেকার। কারণ, তাওরাত ইব্রাহীম ও ইয়াকুব (আলাইহিমাস্ সালাম)-এর অনেক পরে নাযিল হয়। অতএব কিভাবে তোমরা উক্ত অভিযোগ উত্থাপন কর? তাছাড়া তাওরাতে কিছু জিনিস তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে কেবল তোমাদের যুলুম ও অবাধ্যতার কারণে। *(সূরা আনআম ৪৬, সূরা নিসা ১৬০)* যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পড়ে শুনাও, দেখবে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, ইব্রাহীম ﷺ-এর যামানায় এ জিনিসগুলো হারাম ছিল না এবং তোমাদের উপর যা কিছু জিনিস হারাম করা হয়েছে তা কেবল তোমাদের যুলুম ও সীমালঙ্ঘনের কারণে। অর্থাৎ, শাস্তি স্বরূপ তা হারাম করা হয়েছিল। *(আয়সারুত তাফাসীর)*

(৪) এটা হল ইয়াহুদীদের দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তর। তারা বলত, বায়তুল মাক্বদিস তো প্রথম ইবাদত-খানা, মুহাম্মাদ ﷺ এবং তার সাথীরা নিজেদের ক্বিবলা কেন পরিবর্তন করে নিলো? এর উত্তরে বলা হল, তোমাদের এই দাবীও ভুল। প্রথম যে ঘর আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত হয়, তা হল সেই ঘর, যা মক্কায় রয়েছে।

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

(পাথরের উপর ইব্রাহীমের পদচিহ্ন)। যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে, সে নিরাপত্তা লাভ করে।[৫] মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য।[৬] আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী।[৭]

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَاللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (٩٨)

(৯৮) বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! কেন তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা যা কর আল্লাহ তার সাক্ষী।'

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ(٩٩)

(৯৯) বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! তোমরা বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দান করছ কেন? তোমরা তার বক্রতা অন্বেষণ করছ; অথচ তোমরাই (এ বিষয়ে) সাক্ষী।[৮] আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে উদাসীন নন।'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (١٠٠)

(১০০) হে বিশ্বাসিগণ! যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের দলবিশেষের আনুগত্য কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমানের (বিশ্বাসের) পর আবার অবিশ্বাসী (কাফেরে) পরিণত ক'রে ছাড়বে।[৯]

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٠١)

(১০১) কিরূপে তোমরা কাফের হয়ে যাবে? অথচ আল্লাহর আয়াত তোমাদের নিকট পাঠ করা হয় এবং তোমাদের মধ্যেই তাঁর রসূলও বিদ্যমান রয়েছে। আর যে আল্লাহকে অবলম্বন করবে,[১০] সে অবশ্যই সরল পথ পাবে।

(৫) যেহেতু এখানে যুদ্ধ, খুনাখুনি এবং শিকার করা --এমনকি গাছ কাটাও নিষিদ্ধ। (বুখারী-মুসলিম)

(৬) 'যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে' অর্থাৎ, সম্পূর্ণ রাহা-খরচ পূরণ হওয়ার মত যথেষ্ট পাথেয় যার কাছে আছে। অনুরূপ রাস্তার ও জান-মালের নিরাপত্তা এবং শারীরিক সুস্থতা ইত্যাদিও সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। মহিলার জন্য মাহরাম (স্বামী অথবা যার সঙ্গে তার বিবাহ চিরতরে হারাম এমন কোন লোক) থাকাও জরুরী। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* এই আয়াত প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল। হাদীস দ্বারা এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হজ্জ জীবনে একবারই ফরয। *(ইবনে কাসীর)*

(৭) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করাকে কুরআন 'কুফরী' (অস্বীকার) বলে আখ্যায়িত করেছে। এ থেকে হজ্জ ফরয হওয়ার এবং তা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সে ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বহু হাদীসেও সাহাবীদের উক্তিতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হজ্জ করে না, তার ব্যাপারে কঠোর ধমক এসেছে। *(ইবনে কাসীর)*

(৮) অর্থাৎ, তোমরা জানো যে, ইসলাম সত্য দ্বীন। এই দ্বীনের প্রতি আহবানকারী আল্লাহর সত্য পয়গম্বর। কারণ, এই কথাগুলো সেই কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ, যা তোমাদের নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমরা পড়ে থাক।

(৯) ইয়াহুদীদের চক্রান্ত ও প্রতারণা এবং তাদের পক্ষ হতে মুসলিমদের ভ্রষ্ট করার নিকৃষ্টতম প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করার পর মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমরাও তাদের কূট-চক্রান্তের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকবে। সাবধান! কুরআন তেলাঅত এবং রসূল ﷺ-এর বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তোমরা যেন তাদের জালে ফেঁসে না যাও। তফসীরের বর্ণনায় এর প্রেক্ষাপট এইভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, আনসারের দু'টি গোত্র আউস এবং খাযরাজ কোন এক মজলিসে এক সাথে বসে আলাপ-আলোচনা করছিল। ইত্যবসরে শাস বিন ক্বাইস ইয়াহুদী তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের পারস্পরিক এই সৌহার্দ্য দেখে জ্বলে উঠল। যারা একে অপরের কঠোর শত্রু ছিল, তারা আজ ইসলামের বর্কতে দুধে চিনির মত পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে! সে একজন যুবককে দায়িত্ব দিল যে, তুমি তাদের মাঝে গিয়ে সেই 'বুআয' যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দাও, যা হিজরতের পূর্বে তাদের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যে বীরত্ব প্রকাশক কবিতাগুলো পড়েছিল, তা ওদেরকে শুনাও। সে যুবক গিয়ে তা-ই করল। ফলে উভয় গোত্রের পূর্বের আক্রোশ-আগুন পুনরায় জ্বলে উঠলো এবং পরস্পরকে গালাগালি করতে লাগল। এমন কি অস্ত্র ধারণের জন্য একে অপরকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। আপোসে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। এমন সময় রসূল ﷺ উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বুঝালেন। তারা বিরত হয়ে গেলো। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত এবং পরের আয়াতও নাযিল হয়। *(ইবনে কাসীর ও ফাতহুল ক্বাদীর ইত্যাদি)*

(১০) اِعْتِصَامٌ بِاللهِ (আল্লাহকে অবলম্বন করা)র অর্থ হল, আল্লাহর দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং তাঁর আনুগত্যে গড়িমসি না করা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)

(১০২) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর[১১] এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣)

(১০৩) তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর[১২] এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[১৩] তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ(١٠٤)

(১০৪) তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই হবে সফলকাম।

وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥)

(১০৫) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে[১৪] ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

---

(১১) এর অর্থ হল, ইসলামের যাবতীয় বিধান মেনে চলা, তার ওয়াজেব কাজগুলো সম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং যত নিষিদ্ধ বস্তু আছে, তার ধারে-কাছেও না যাওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত নাযিল হলে সাহাবাগণ বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েন। তাই মহান আল্লাহ [فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ] (তোমরা তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর।) আয়াত অবতীর্ণ করেন। তবে এই আয়াতকে উক্ত আয়াতের 'নাসিখ' (রহিতকারী) মনে না ক'রে তার ব্যাখ্যাকারী মনে করাই বেশী সঠিক। কারণ, নাস্খ তখনই মনে করতে হয়, যখন উভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব না হয়। এখানে তো উভয় আয়াতের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করা সম্ভব। যেমন এইভাবে অর্থ করা, «اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ مَاسْتَطَعْتُمْ» "আল্লাহকে ঐভাবেই ভয় কর, যেভাবে স্বীয় সাধ্যমত তাঁকে ভয় করা উচিত।" *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১২) আল্লাহকে ভয় করার কথা বলার পর 'তোমরা সকলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে ধর'এর আদেশ দিয়ে এ কথা পরিষ্কার করে দিলেন যে, মুক্তিও রয়েছে এই দুই মূল নীতির মধ্যে এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে ও থাকতে পারে এই মূল নীতিরই ভিত্তিতে।

(১৩) وَلاَ تَفَرَّقُوا "পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" এর মাধ্যমে দলে দলে বিভক্ত হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ, উল্লিখিত দু'টি মূল নীতি থেকে যদি তোমরা বিচ্যুত হয়ে পড়, তাহলে তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং ভিন্ন ভিন্ন দলে তোমরা বিভক্ত হয়ে যাবে। বলাই বাহুল্য যে, বর্তমানে দলে দলে বিভক্ত হওয়ার দৃশ্য আমাদের সামনেই রয়েছে। কুরআন ও হাদীস বোঝার এবং তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নিয়ে পারস্পরিক কিছু মতপার্থক্য থাকলেও তা কিন্তু দলে দলে বিভক্ত হওয়ার কারণ নয়। এ ধরনের বিরোধ তো সাহাবী ও তাবেঈনদের যুগেও ছিল, কিন্তু তাঁরা ফির্কাবন্দী সৃষ্টি করেননি এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েও যাননি। কারণ, তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও সকলের আনুগত্য ও আক্বীদার মূল কেন্দ্র ছিল একটাই। আর তা হল, কুরআন এবং হাদীসে রসূল ﷺ। কিন্তু যখন ব্যক্তিত্বের নামে চিন্তা ও গবেষণা কেন্দ্রের আবির্ভাব ঘটল, তখন আনুগত্য ও আক্বীদার মূল কেন্দ্র পরিবর্তন হয়ে গেল। আপন আপন ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের উক্তি ও মন্তব্যসমূহ প্রথম স্থান দখল করল এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উক্তিসমূহ দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হল। আর এখান থেকেই মুসলিম উম্মাহর মাঝে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা শুরু হল; যা দিনে দিনে বাড়তেই লাগল এবং বড় শক্তভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেল।

(১৪) 'সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে' এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের পারস্পরিক বিরোধ ও দলাদলির কারণ এই ছিল না যে, তারা সত্য জানতো না এবং দলীলাদির ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল, বরং প্রকৃত ব্যাপার হল এই যে, তারা সব কিছু জানা সত্ত্বেও কেবল দুনিয়ার লোভে এবং ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে বিরোধ ও দলাদলির পথ অবলম্বন করেছিল এবং এ পদ্ধতি শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিল। কুরআন মাজীদ বারংবার বিভিন্নভাবে (তাদের) প্রকৃত ব্যাপারকে তুলে ধরেছে এবং তা থেকে দূরে থাকার তাকীদও করেছে। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে, এই উম্মতের বিভেদ সৃষ্টিকারীরাও ঠিক ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের মতই স্বভাব অবলম্বন করেছে। তারাও সত্য এবং তার প্রকাশ্য দলীলাদি খুব ভালভাবেই জানে, তা সত্ত্বেও তারা দলাদলি ও ভাগাভাগির উপর শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির সমস্ত মেধাকে বিগত জাতিদের মত (শরীয়তের) অপব্যাখ্যা এবং বিকৃতি করার জঘন্য কাজে নষ্ট করছে।

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦)

(১০৬) সেদিন কতকগুলো মুখমন্ডল সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং কতকগুলো মুখমন্ডল কালো হবে।[১৫] যাদের মুখমন্ডল কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে), বিশ্বাসের পর কি তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে? সুতরাং তোমরা অবিশ্বাস করার পরিণামে শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর।

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٠٧)

(১০৭) আর যাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বলবর্ণ হবে, তারা আল্লাহর করুণায় অবস্থান করবে। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।

تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (١٠٨)

(১০৮) এগুলি আল্লাহর আয়াত, তোমার নিকট সত্যসহ আবৃত্তি করছি। আল্লাহ বিশ্ব-জগতের প্রতি অবিচার করার ইচ্ছা রাখেন না।

وَلِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ (١٠٩)

(১০৯) গগনে ও ভুবনে যা কিছু আছে, সব কিছুই আল্লাহর; আল্লাহরই কাছে সব কিছু ফিরে যাবে।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ (١١٠)

(১১০) তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ করবে, আর আল্লাহতে বিশ্বাস করবে।[১৬] গ্রন্থধারিগণ যদি বিশ্বাস করত, তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হত। তাদের মধ্যে বিশ্বাসী আছে,[১৭] কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (١١١)

(১১১) সামান্য ক্লেশ দেওয়া ছাড়া কদাচ তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।[১৮]

([১৫]) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এ থেকে আহলে-সুন্নাত এবং আহলে-বিদআতকে বুঝিয়েছেন। *(ইবনে কাসীর ও ফাতহুল ক্বাদীর)* (অর্থাৎ, কিয়ামতে সুন্নাহর অনুসারীদের চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং বিদআতীদের চেহারা কালো হবে।) আর এ থেকে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, ইসলাম হল ওটাই, যার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আহলে-সুন্নাত। আহলে-বিদআত এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। অথচ এটাই হল মুক্তির একমাত্র পথ।

([১৬]) এই আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ উম্মত গণ্য করা হয়েছে এবং তার কারণ কি তাও বলে দেওয়া হয়েছে। আর তা হল, ভাল কাজের আদেশ দেওয়া, মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখা। অর্থাৎ, মুসলিম উম্মার মধ্যে যদি এই (ভাল কাজের আদেশ দেওয়া, মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখার) বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে তারা শ্রেষ্ঠ উম্মত। অন্যথা এই উপাধি থেকে তারা বঞ্চিত হবে। এরপর আহলে কিতাবের নিন্দাবাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল, এই বিষয়টিকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া যে, যদি এই উম্মত ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান না করে, তাহলে তারাও তাদের মত বিবেচিত হবে। কেননা আহলে কিতাবের গুণ হল, [كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ] "তারা যে মন্দ কাজ করত, তা থেকে তারা একে অপরকে নিষেধ করত না।" *(মায়েদাহ ঃ ৭৯)* এখানে এই আয়াতে তাদের অধিকাংশ লোককে ফাসেক্ব বলা হয়েছে। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান করার শরয়ী মান 'ফারযে আইন' (যা করা উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয), নাকি 'ফারযে কিফায়াহ' (যা উম্মতের কিছু লোক সম্পাদন করলে সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে, আর কেউ না করলে সকলেই গুনাহগার হবে।)? অধিকাংশ আলেমের মতে এটা 'ফারযে কিফায়াহ'। অর্থাৎ, আলেমদের দায়িত্ব হল, তাঁরা এই ফরয আদায় করবেন। কারণ, শরীয়তের দৃষ্টিতে ভাল ও মন্দ নির্বাচনের সঠিক জ্ঞান তাঁদেরই আছে। তাঁরা যদি দ্বীনের দাওয়াত ও তবলীগের দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে উম্মতের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হতে এ ফরয আদায় হয়ে যাবে। যেমন, জিহাদও সাধারণ অবস্থায় 'ফারযে কিফায়া'। অর্থাৎ, কোন একটি দল এ কাজ আদায় করলেই তা যথেষ্ট হবে। (অনেকের মতে উক্ত আদেশ ও নিষেধ করার কাজ নিজ নিজ জ্ঞান ও সাধ্য অনুযায়ী প্রত্যেকের উপর ফরয। আর এ কথাই সঠিক বলে মনে হয়। অল্লাহু আ'লাম। *-সম্পাদক*)

([১৭]) যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ ও অন্য কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য তাঁদের সংখ্যা খুবই স্বল্প ছিল। আর এই জন্যই «مِنْهُمْ» এ مِن 'হারফে তাব্ঈয' তথা স্বল্পতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

([১৮]) أَذًى (কষ্ট দেওয়া) বলতে মৌখিকভাবে মিথ্যা অপবাদ রটানো। এর দ্বারা সাময়িকভাবে অবশ্যই কষ্ট হয়। তবে যুদ্ধের ময়দানে তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। হলও তা-ই। মদীনা থেকেও ইয়াহুদীদেরকে বের হতে হল। অতঃপর

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (١١٢)

(১১২) আল্লাহ ও মানুষের আশ্রয় ছাড়া[১৯] যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন, সেখানেই তাদের ভাগ্যে লাঞ্ছনা নির্ধারিত করা হয়েছে, তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং তাদের জন্য দারিদ্র্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এ জন্য যে, তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করত এবং অন্যায়রূপে নবীগণকে হত্যা করত। আর এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালংঘন করেছিল।[২০]

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣)

(১১৩) তারা সকলে সমান নয়।[২১] ঐশীগ্রন্থধারীদের মধ্যে একটি হকপন্থী দল আছে; তারা রাত্রিকালে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর আয়াত পাঠ করে।

يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٤)

(১১৪) তারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ করে এবং তারা সৎকার্যে তৎপর থাকে। তারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ(١١٥)

(১১৫) তারা যা কিছু উত্তম কাজ করে, ফলতঃ তা কখনই ব্যর্থ হবে না। আর আল্লাহ ধর্মভীরুদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(١١٦)

(১১৬) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে, তাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কখনো কোন কাজে লাগবে না। তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।

খায়বার জয় করলে সেখান থেকেও বের হল। অনুরূপ শাম (সিরিয়া) অঞ্চলে খ্রিষ্টানদেরকে মুসলিমদের হাতে পরাজিত হতে হয়। ক্রুসেড যুদ্ধে খ্রিষ্টানরা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালায় এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস দখল ক'রে নেয়। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যূবী ৯০ বছর পর পুনরায় তা ফিরিয়ে আনেন। বর্তমানে মুসলিমদের ঈমানী দুর্বলতার ফল স্বরূপ এবং ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের মিলিত চক্রান্ত ও প্রচেষ্টায় বায়তুল মুক্বাদ্দাস আবারও মুসলিমদের হাতছাড়া হয়েছে। তবে অতি সত্বর এমন সময় আসবে যে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে, বিশেষ করে ঈসা ﷺ-এর অবতরণের পর খ্রিষ্টবাদের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত হবে। *(ইবনে কাসীর)*

(১৯) আল্লাহর গযবের ফল স্বরূপ ইয়াহুদীদের উপর যে লাঞ্ছনা ও দরিদ্রতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে সাময়িকভাবে বাঁচার দু'টি উপায় বলা হয়েছে। এক হল, তাদেরকে আল্লাহর আশ্রয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ, হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা ইসলামী দেশে কর বা ট্যাক্স দিয়ে আশ্রিত হয়ে থাকা পছন্দ করবে। দ্বিতীয় হল, তারা মানুষের আশ্রয় লাভ করবে। আর এর দু'টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, (ক) ইসলামী দেশের সরকার নয়, বরং কোন সাধারণ মুসলিম তাদের আশ্রয় দেবে। আর এই অধিকার প্রত্যেক মুসলিমের আছে এবং দেশের সরকারকে তাকীদ করা হয়েছে যে, সে যেন কোন নিম্ন পর্যায়ের মুসলিমের দেওয়া আশ্রয়কেও প্রত্যাখ্যান না করে। (খ) তারা বড় কোন অমুসলিম শক্তির সহায়তা লাভ করবে। কারণ, 'নাস' (মানুষ) সাধারণ শব্দ যা মুসলিম ও অমুসলিম সকলকেই শামিল করে।

(২০) এ হল তাদের কুকর্ম, যার প্রতিফল স্বরূপ তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(২১) অর্থাৎ, পূর্বের আয়াতে যেসব আহলে-কিতাবের নিন্দাবাদ আলোচিত হয়েছে, তাদের সকলে এক রকম ছিল না, বরং তাদের মধ্যে কিছু ভাল মানুষও ছিলেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, উসায়েদ ইবনে উবায়েদ, সা'লাবা ইবনে সা'য়্যাহ এবং উসায়েদ ইবনে সা'য়্যাহ প্রভৃতি যাঁরা আল্লাহর তাওফীক্বে ইসলাম কবুল করার মর্যাদা লাভে ধন্য হন এবং তাঁদের মধ্যে ঈমান ও আল্লাহভীরুতার গুণ বিদ্যমান ছিল- রাযীআল্লাহু আনহুম অ রাযু আনহু- (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।) أُمَّةٌ قَائِمَةٌ (হকপন্থী দল)এর অর্থ হল, শরীয়তের এবং নবী করীম ﷺ-এর অনুসরণ ও আনুগত্যকারী দল। يَسْجُدُوْنَ (সিজদা বা নামায পড়া)এর অর্থ হল, তারা রাত জেগে তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করে এবং নামাযে কুরআন তেলাঅত করে। ভাল কাজের আদেশের অর্থ এখানে কেউ কেউ এই করেছেন যে, তারা নবী করীম ﷺ-এর উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিতো এবং তাঁর বিরোধিতা করতে নিষেধ করত। এই দলের কথা অন্য আয়াতেও আলোচিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় গ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে যারা আল্লাহতে, তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আল্লাহর নিকট বিনয়াবনত হয়ে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর আয়াতকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে না; এরাই তো সেই সকল লোক যাদের জন্য আল্লাহর নিকট পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" *(সূরা আলে ইমরান ১৯৯ আয়াত)*

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٧)

(১১৭) তারা যা কিছু পার্থিব জীবনে ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত হিম-শীতল ঝঞ্ঝা বায়ুর মত, যা যে জাতি নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে, তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও তা বিনষ্ট ক'রে দেয়।[২২] বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করেন না, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম ক'রে থাকে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨)

(১১৮) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য (অবিশ্বাসী) কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।[২৩] তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে কোন ত্রুটি করবে না। যাতে তোমরা বিপন্ন হও, তাই তারা কামনা করে।[২৪] তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং যা তাদের অন্তর গোপন রাখে, তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর।

هَاأَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنْ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١١٩)

(১১৯) ভেবে দেখ! তোমরা (বন্ধু ভেবে) তাদেরকে ভালবাস;[২৫] কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস কর, (কিন্তু তারা তোমাদের কিতাবে বিশ্বাস করে না) এবং যখন তারা তোমাদের সাক্ষাতে আসে, তখন তারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি।' কিন্তু যখন তারা একা হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙ্গুল দাঁতে কাটে।[২৬] বল, আক্রোশেই মর তোমরা। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরে যা রয়েছে, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

---

(২২) কিয়ামতের দিন কাফেরদের ধন-সম্পদ না কোন উপকারে আসবে, না তাদের সন্তান-সন্ততি; এমন কি বাহ্যিকভাবে জন-সাধারণের কল্যাণ ও মঙ্গলের কাজে যে সব অর্থ ব্যয় করে, তাও ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর এর উদাহরণ হল, সেই প্রচন্ড ঠান্ডা অথবা গরম প্রবল ঝড়ো হাওয়ার মত, যা সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেতকে ধ্বংস করে দেয়। অত্যাচারী তো এই ক্ষেত দেখে বড়ই আনন্দবোধ করে এবং তার লাভের প্রতি চরম আশাবাদী থাকে, কিন্তু হঠাৎ ক'রে তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা মাটিতে মিশে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, কল্যাণ ও মঙ্গলের কাজে অর্থ ব্যয়কারীদের দুনিয়াতে যতই প্রশংসা হোক না কেন, ঈমান না আনা পর্যন্ত আখেরাতে তারা এ সব কাজের কোনই প্রতিদান পাবে না। সেখানে আছে তাদের জন্য জাহান্নামের চিরন্তন শাস্তি।

(২৩) এই বিষয়টা পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। বিষয়টা যেহেতু অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। بِطَانَة বলা হয় অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত বন্ধু এবং রহস্যবিদ্‌কে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকরা যে সব অসদিচ্ছা ও দুরভিসন্ধি রাখে এবং তার মধ্যে যা তারা প্রকাশ করে আর যা নিজেদের অন্তরে গোপন রাখে, তার সব কিছুকেই মহান আল্লাহ (কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে) চিহ্নিত ক'রে দিয়েছেন। এই আয়াত এবং এই ধরনের অন্য আয়াতসমূহের ভিত্তিতে উলামা ও ফক্বীহগণ লিখেছেন যে, কোন ইসলামী দেশে অমুসলিমদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কোন (নেতৃত্ব) পদে নিযুক্ত করা জায়েয নয়। বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ মুসা আশআরী ﷺ একজন অমুসলিমকে সেক্রেটারী (কর্মসচিব) নিযুক্ত করেন। উমার ﷺ এ ব্যাপার জানতে পারলে তাঁকে কঠোর ধমক দিয়ে বলেন, 'তুমি ওদেরকে তোমার কাছে টেনে নিও না, যখন আল্লাহ ওদেরকে দূর করে দিয়েছেন। তুমি ওদের সম্মান দান করো না, যখন আল্লাহ ওদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। আর তুমি ওদেরকে বিশ্বস্ত ও গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য মনে করো না, কারণ আল্লাহ ওদেরকে বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করেছেন।' উমার ﷺ এই আয়াতের ভিত্তিতেই এই ধরনের কথা বলেছেন। ইমাম ক্বুরতুবী বলেন, 'এই যুগে আহলে-কিতাবকে সেক্রেটারী নিযুক্ত এবং বিশ্বস্ত মনে করার কারণে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং এই কারণেই নির্বোধ ও বোকা প্রকৃতির লোকেরা নেতা ও আমীর হয়ে বসে আছে।' *(তাফসীর ক্বুরতুবী)* দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে বহু মুসলিম দেশেও কুরআন কারীমের অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই নির্দেশের কোনই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। তাই তো অমুসলিমরা মুসলিম দেশেও বড় বড় পদে এবং বিশেষ বিশেষ দায়িত্বে বহাল রয়েছে। আর এর অনিষ্টকারিতা যে কত বড় তা সকলের কাছে পরিষ্কার। যদি মুসলিম দেশগুলো স্বীয় দেশের স্বরাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতির ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশকে গুরুত্ব দিত, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা বহু ফিতনা-ফাসাদ ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেত।

(২৪) لَا يَأْلُوْنَ ত্রুটি ও কসুর করবে না। خَبَالاً এর অর্থ ঃ বিশৃঙ্খলা, অনিষ্ট ও কষ্ট। مَا عَنِتُّمْ (যাতে তোমরা বিপন্ন হও, কষ্টে পতিত হও) عَنَتٌ মানে কষ্ট, বিপদ।

(২৫) অর্থাৎ, তোমরা ঐ মুনাফিক্বদের নামায এবং (মৌখিকভাবে) তাদের ঈমান প্রকাশ করার কারণে ধোঁকায় পড়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কর।

(২৬) عَضَّ يَعُضُّ এর অর্থ হল দাঁত দিয়ে কাটা। এই শব্দ দ্বারা তাদের রোষ ও ক্রোধের ভীষণতা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন পরের [إِنْ تَمْسَسْكُمْ] আয়াতেও তাদের ক্রোধের ধরন প্রকাশ করা হয়েছে।

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (١٢٠)

(১২০) যদি তোমাদের কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তারা নাখোশ হয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা খোশ হয়।[২৭] যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।[২৮] তারা যা করে, নিশ্চয় তা আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে।

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٢١)

(১২১) (স্মরণ কর) যখন (উহুদ) যুদ্ধের[২৯] জন্য বিশ্বাসীদেরকে যথাস্থানে সংস্থাপিত করার লক্ষ্যে তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট থেকে প্রত্যূষে বের হয়েছিলে; এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٢٢)

(১২২) যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দলের মনোবল হারাবার উপক্রম হয়েছিল[৩০] এবং আল্লাহ ছিলেন উভয়ের সহায়ক।[৩১] আর বিশ্বাসীদের উচিত, আল্লাহর উপরেই নির্ভর করা।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢٣)

(১২৩) নিশ্চয় বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, তখন তোমরা ছিলে হীনবল।[৩২] সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

([২৭]) মুনাফিক্বরা মু'মিনদের সাথে যে কঠোর শত্রুতা পোষণ করত, সে কথা এখানে তুলে ধরে বলা হচ্ছে যে, যখন মুসলিমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করত, আল্লাহর পক্ষ হতে যখন তারা সমর্থন ও সাহায্য পেত এবং তাদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি লাভ করত, তখন মুনাফিক্বদেরকে বড়ই খারাপ লাগত। আর যখন মুসলিমরা অনাবৃষ্টি ও সংকীর্ণতার শিকার হত অথবা আল্লাহর ইচ্ছা ও কৌশলের ভিত্তিতে শত্রু সাময়িকভাবে তাদের উপর জয়লাভ করত (যেমন উহুদ যুদ্ধে হয়েছিল), তখন এরা বড়ই খুশী হত। বলার উদ্দেশ্য হল, যাদের অবস্থা হল এই, তারা কি এই যোগ্যতার অধিকারী যে, মুসলিমরা তাদের প্রতি সম্প্রীতির হাত বাড়াবে এবং তাদেরকে রহস্যবিদ্ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ে নেবে? এই কারণেই মহান আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের সাথেও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন (যেমন কুরআনের অন্যত্র এসেছে)। কেননা, তারাও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে। মুসলিমদের সফলতায় তারা নিরানন্দ এবং তাদের অসফলতায় তারা আনন্দ বোধ করে।

([২৮]) এটা হল তাদের প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা থেকে বাঁচার পথ ও চিকিৎসা। অর্থাৎ, মুনাফিক্ব এবং ইসলাম ও মুসলিমদের অন্যান্য সকল শত্রুর চক্রান্ত থেকে বাঁচার জন্য ধৈর্য ও আল্লাহভীরুতার প্রয়োজন অত্যধিক। মুসলিমদের মাঝে এই ধৈর্য ও তাক্বওয়া না থাকার ফলেই অমুসলিমদের যাবতীয় চক্রান্ত সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। মানুষ মনে করে যে, কাফেরদের সফলতার কারণ হল, আর্থিক উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় তাদের উন্নতি। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হল, মুসলিমদের অবনতির মূল কারণ তাদের দ্বীনের উপর ধৈর্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত না থাকা এবং তাক্বওয়া-শূন্যতা। পক্ষান্তরে এই দু'টি জিনিসই হল মুসলিমদের উন্নতির চাবিকাঠি এবং আল্লাহর বিজয় লাভের অসীলা।

([২৯]) বেশীরভাগ মুফাস্সেরদের মতানুযায়ী এটা হল উহুদ যুদ্ধের ঘটনা, যা ৬ই শাওয়াল হিজরী ৩য় সনে সংঘটিত হয়েছিল। এর সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট হল, হিজরী ২য় সনে বদরের যুদ্ধে কাফেররা শিক্ষামূলক পরাজয় বরণ করে, তাদের ৭০জন লোক মারা যায় এবং ৭০জন বন্দী হয়। আর এই পরাজয় ছিল তাদের জন্য বড়ই লাঞ্ছনাকর ও অপমানজনক। তাই তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অতীব শক্তিশালী এক প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং এতে তাদের মহিলারাও শরীক হয়। এদিকে মুসলিমরা যখন জানতে পারলেন যে, তিন হাজার কাফের উহুদ পাহাড়ের নিকটে যুদ্ধের তাঁবু খাটিয়েছে, তখন নবী করীম ﷺ সাহাবাদের নিয়ে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন যে, তাঁরা মদীনার ভিতরে থেকেই যুদ্ধ করবেন, না মদীনার বাইরে গিয়ে তাদের সাথে লড়বেন। কোন কোন সাহাবী ভিতর থেকেই যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন এবং মুনাফিক্বদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও এই মত প্রকাশ করেছিল। কিন্তু উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ কিছু সাহাবী যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি, তাঁরা মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার কথা সমর্থন করলেন। মহানবী ﷺ হুজরার ভিতরে গিয়ে যুদ্ধের পোশাক পরে বাইরে এলেন। তা দেখে দ্বিতীয় মত প্রকাশকারীগণ অনুতপ্ত হলেন। তাঁরা ভাবলেন, হয়তো আমরা নবী করীম ﷺ-এর ইচ্ছার বিপরীত তাঁকে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য ক'রে সঠিক কাজ করিনি। তাই তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি শহরের ভিতরে থেকে মোকাবেলা করা পছন্দ ক'রে থাকেন, তবে তা-ই করুন! তিনি বললেন, যুদ্ধের পোশাক পরে নেওয়ার পর কোন নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি আল্লাহর ফয়সালা ব্যতিরেকে ফিরে যাবেন অথবা পোশাক খুলে ফেলবেন। সুতরাং এক হাজার মুসলিম যোদ্ধা যুদ্ধের জন্য রওনা হয়ে গেলেন। অতি সকালে যখন তাঁরা 'শাউত্ব' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এই বলে তার ৩ শ' জন সাথীকে নিয়ে ফিরে গেল যে, তার মত গ্রহণ করা হয়নি। সুতরাং অকারণে জান দিয়ে লাভ কি? তার এই ফায়সালায় সাময়িকভাবে কোন কোন মুসলিম প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের অন্তর দুর্বল হয়ে পড়েছিল। *(ইবনের কাষীর)*

([৩০]) এরা ছিল আউস ও খাযরাজ নামে দু'টি গোত্র (বানু-হারিসা ও বানু-সালামা)।

([৩১]) এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাঁদের সাহায্য করেন এবং মনের দুর্বলতাকে দূর ক'রে তাঁদের সাহস বাড়িয়ে দেন।

([৩২]) যেহেতু যোদ্ধাদের সংখ্যা কম ছিল এবং যুদ্ধ-সামগ্রীও অল্প ছিল। এ যুদ্ধে মুসলিম ছিলেন ৩১৩ জন এবং যুদ্ধ-সামগ্রীও ছিল অতীব স্বল্প। কেবল দু'টি ঘোড়া এবং সত্তরটি উট এবং অবশিষ্ট সবাই ছিলেন পদাতিক।

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ (١٢٤)

(১২৪) (স্মরণ কর,) যখন তুমি বিশ্বাসিগণকে বলেছিলে, 'যদি তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার প্রেরিত ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তাহলে কি তোমাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে না?'

بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٢٥)

(১২৫) অবশ্যই, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল, তাহলে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার[৩৩] (বিশেষরূপে) চিহ্নিত ফিরিশ্তা[৩৪] দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١٢٦)

(১২৬) আর এ (সাহায্যকে) তো আল্লাহ তোমাদের জন্য সুসংবাদ করেছেন, যাতে তোমাদের মন শান্তি পায় এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট থেকেই আসে।

لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ (١٢٧)

(১২৭) এই জন্য যে, তিনি অবিশ্বাসীদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন অথবা লাঞ্ছিত করেন; ফলে তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যায়।[৩৫]

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ

(১২৮) এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই,[৩৬] তিনি (আল্লাহ) তাদের তওবা কবুল করবেন[৩৭] অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। কারণ, তারা অত্যাচারী।

---

(৩৩) মুসলিমরা তো কুরাইশদের নিরস্ত্র বাণিজ্যিক কাফেলার উপর আক্রমণ করার জন্য বদরের দিকে যাত্রা করেছিলেন। বদর পৌঁছে তাঁরা জানতে পারলেন, মক্কা থেকে মুশরিকদের এক সৈন্যদল বিপুল সংখ্যায় পূর্ণ ক্রোধ ও রোষের সাথে এবং পুরো উদ্যমে আগমন করছে। এ কথা শুনে মুসলিমদের মধ্যে হতবুদ্ধিতা ও অস্থিরতা মিশ্রিত যুদ্ধের উদ্দীপনা জেগে উঠল এবং তাঁরা মহান প্রভুর নিকট দুআ ও ফরিয়াদ করলেন। ফলে মহান আল্লাহ প্রথমে এক হাজার এবং পরে আরো তিন হাজার ফিরিশ্তা প্রেরণের সুসংবাদ দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তোমরা যদি ধৈর্য ও তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আর মুশরিকরা যদি এই ক্রোধ ও রোষের সাথে এসে পড়ে, তবে অতিরিক্ত আরো পাঁচ হাজার ফিরিশ্তা প্রেরণ করা হবে। বলা হয় যে, মুশরিকদের উদ্যম ও ক্রোধ স্থায়ী হতে পারেনি (বদর প্রান্তে পৌঁছনোর আগেই তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। একদল মক্কা প্রত্যাবর্তন করে এবং অবশিষ্ট যারা বদর পর্যন্ত ছিল তাদের অধিকাংশ সর্দারদের মত ছিল যুদ্ধ না করা), তাই সুসংবাদ অনুযায়ী তিন হাজার ফিরিশ্তা প্রেরণ করা হয় এবং পাঁচ হাজার সংখ্যা পূরণ করার প্রয়োজন পড়েনি। তবে কোন কোন মুফাস্সের বলেছেন যে, এই সংখ্যা পূর্ণ করা হয়েছিল।

(৩৪) অর্থাৎ, চিনার জন্য তাঁদের বিশেষ নির্দশন থাকবে।

(৩৫) এখানে মহান পরাক্রমশালী ইচ্ছাময় আল্লাহর সাহায্যের ফলাফল বর্ণনা করা হচ্ছে। সূরা আনফালে (৯নং আয়াতে) ফিরিশ্তাদের সংখ্যা এক হাজার বলা হয়েছে। [إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ] "তোমরা যখন স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদ শুনে বললেন যে, আমি এক হাজার ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করব।" শব্দের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, আসলে ফিরিশ্তা এক হাজারই প্রেরণ করা হয়েছিল এবং মুসলিমদের উৎসাহ ও মনোবল বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আরো তিন থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত পাঠানোর শর্ত ভিত্তিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর পরিস্থিতি অনুযায়ী মুসলিমদের সান্ত্বনার জন্যও অতিরিক্তি ফিরিশ্তা প্রেরণ করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। এই জন্যই কোন কোন মুফাস্সেরের মতে এই তিন ও পাঁচ হাজার ফিরিশ্তা প্রেরণ করা হয়নি। কারণ, উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের মনোবল বৃদ্ধি করা। তাছাড়া প্রকৃত সাহায্যকারী তো মহান আল্লাহই। তিনি সাহায্য করার জন্য ফিরিশ্তা অথবা অন্য কারো মুখাপেক্ষী নন। বলা বাহুল্য, তিনি মুসলিমদের সাহায্য করলে বদর যুদ্ধে মুসলিমরা ঐতিহাসিক সফলতা অর্জন করেন। কুফ্রী শক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং কাফেরদের অহংকার মাটিতে মিশে যায়। *(আয়সারুত তাফাসীর)*

(৩৬) অর্থাৎ, এই কাফেরদেরকে হেদায়াত দেওয়া অথবা তাদের ব্যাপারে যে কোন প্রকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সব কিছুই আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। বহু হাদীসে এসেছে যে, উহুদ যুদ্ধে নবী করীম ﷺ-এর দাঁত শহীদ এবং মুখমন্ডল আহত হলে তিনি বলেছিলেন, "এমন জাতি কিভাবে সফল হতে পারে, যারা তাদের নবীকে আহত করে।" তিনি যেন তাদের হেদায়াত থেকে নিরাশা প্রকাশ করেন। যার ফলে এই আয়াত অবতীর্ণ হল। অনুরূপ অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি ﷺ কাফেরদের উপর বদ্দুআ করার জন্য ক্বুনুতে নাযেলার যত্ন নিলে মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। অতঃপর তিনি ﷺ বদ্দুআ করা বাদ দেন। *(ইবনে কাসীর, ফাতহুল ক্বাদীর)* এই আয়াত থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা নবী করীম ﷺ-কে ইচ্ছাময় ক্ষমতার মালিক মনে করে। তাঁর তো এতটুকু এখতিয়ারও ছিল না যে, কাউকে সঠিক পথের পথিক ক'রে দেন। অথচ তিনি ﷺ এই পথের দিকে আহবান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন।

(৩৭) এই সেই গোত্র যাদের উপর রসূল ﷺ বদ্দুআ করেছিলেন তারা সকলেই আল্লাহর তাওফীক্বে মুসলমান হয়ে যায়। অতএব এ কথা পরিষ্কার যে, সমস্ত ক্ষমতার মালিক এবং অদৃশ্য জগতের (গায়বী) জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (١٢٨)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢٩)

(১২৯) আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সমস্তই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

(১৩০) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ক্রমবর্ধমান হারে (দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বা চক্রবৃদ্ধি হারে) সূদ খেয়ো না,[৩৮] এবং আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (١٣١)

(১৩১) তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٣٢)

(১৩২) আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা কৃপালাভ করতে পার।

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣)

(১৩৩) তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেশ্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।[৩৯]

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤)

(১৩৪) যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,[৪০] ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা ক'রে থাকে।[৪১] আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥)

(১৩৫) যারা কোন অশ্লীল কাজ ক'রে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।[৪২] আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা (অপরাধ) ক'রে ফেলে, তাতে জেনে-শুনে অটল থাকে না।

أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ(١٣٦)

(১৩৬) ঐ সকল লোকের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা এবং জান্নাত; যার নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এবং (সৎ)কর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম।

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ

(১৩৭) অতীতে তোমাদের পূর্বে বহু ঘটনা অতিবাহিত হয়েছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের পরিণাম

([৩৮]) যেহেতু উহুদ যুদ্ধে পরাজয় রসূল ﷺ-এর অবাধ্যতা এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি লোভের কারণে হয়েছিল, তাই দুনিয়ার লোভনীয় জিনিসের মধ্যে সর্বাধিক মারাত্মক সূদ থেকে নিষেধ এবং আল্লাহর আনুগত্য করার তাকীদ করা হচ্ছে। আর 'চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ' খেতে নিষেধ করার অর্থ এই নয় যে, যদি চক্রবৃদ্ধি হারে না হয়, তাহলে তা খাওয়া জায়েয। বরং সূদ কম হোক বা বেশী, ব্যক্তিবিশেষের নিকট থেকে হোক অথবা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে, তা সর্বাবস্থায় হারামই। যেমন পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। সূদ হারাম হওয়ার জন্য এটা (চক্রবৃদ্ধি হারে খাওয়া) শর্ত নয়। বরং বাস্তব পরিবেশের দিকে লক্ষ্য ক'রে এইভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সেই সময় সূদ খাওয়ার যে পরিবেশ ও ধরন ছিল, তাই প্রকাশ ও বর্ণনা করা হয়েছে। জাহেলিয়াতে সূদের সাধারণ প্রচলন এই ছিল যে, ঋণ পরিশোধ করার সময় এসে যাওয়ার পর তা পরিশোধ করা সম্ভব না হলে, তার (পরিশোধের) সময় বৃদ্ধি করার সাথে সাথে সূদও বর্ধিত হতে থাকত; ফলে সামান্য অর্থও বাড়তে বাড়তে বহুগুণ হয়ে যেত এবং সাধারণ একজন মানুষের পক্ষে তা আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। মহান আল্লাহ বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সেই আগুনকে ভয় কর যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। এ থেকে সতর্ক করাও উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, সূদ খাওয়া থেকে বিরত না হলে, এই হারাম কাজ তোমাদেরকে কুফ্রী পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। কারণ, সূদ খাওয়া মানে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামা।

([৩৯]) পার্থিব ধন-সম্পদের পিছনে পড়ে আখেরাত বরবাদ না ক'রে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের, আল্লাহর ক্ষমা এবং তাঁর সেই জান্নাতের পথ ধর, যা ধর্মভীরু বা মুত্তাক্বীদের জন্য তিনি প্রস্তুত করেছেন। পরের আয়াতগুলোতে মুত্তাক্বীদের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।

([৪০]) অর্থাৎ, কেবল সচ্ছল অবস্থায় নয়, বরং অসচ্ছলতার সময়ও এবং প্রত্যেক অবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রে তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

([৪১]) অর্থাৎ, ক্রোধ তাদেরকে উত্তেজিত করলে তারা তা কার্যকরী না ক'রে সংবরণ ক'রে নেয় এবং তাদের সাথে কেউ অন্যায় করলে তারা তাকে ক্ষমা ক'রে দেয়।

([৪২]) অর্থাৎ, মানবিক প্রবৃত্তিবশে তাদের দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে গেলে, তারা সত্বর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।

কি ছিল![৪৩]

فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (١٣٧)

(১৩৮) এ মানবজাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা আর ধর্মভীরুদের জন্য পথের দিশারী ও উপদেশ।

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٨)

(১৩৯) আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই হবে সর্বোপরি (বিজয়ী); যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।[৪৪]

وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(١٣٩)

(১৪০) তোমাদেরকে যদি (উহুদ যুদ্ধে) কোন আঘাত লেগে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত (বদর যুদ্ধে) তাদেরকেও তো লেগেছে এবং মানুষের মধ্যে এ (বিপদের) দিনগুলিকে পর্যায়ক্রমে আমি অদল-বদল ক'রে থাকি।[৪৫] আর (উহুদের পরাজয় এ জন্য ছিল,) যাতে আল্লাহ বিশ্বাসিগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কিছুকে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না।

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (١٤٠)

(১৪১) এবং যাতে আল্লাহ বিশ্বাসিগণকে পরিশুদ্ধ ও অবিশ্বাসীদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।[৪৬]

وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ(١٤١)

([৪৩]) উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল সাতশ'। তাদের মধ্য থেকে ৫০ জন তীরন্দাজের একটি দলকে রসূল ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ﷺ-এর নেতৃত্বে (জাবালে রুমাত) ছোট পাহাড়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে নিযুক্ত ক'রে বলেছিলেন, আমরা জিতে যাই বা হেরে যাই, কোন অবস্থাতেই তোমরা এখান থেকে নড়বে না। তোমাদের কাজ হবে, কোন অশ্বারোহী এদিকে এলে তাকে তীর ছুঁড়ে পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য করা। কিন্তু যখন মুসলিমরা বিজয় লাভ ক'রে গনীমতের মাল জমা করছিলেন, তখন এই দলের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। কেউ কেউ বলতে লাগলেন, নবী করীম ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে নড়া হবে না। এখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, কাফেররা পশ্চাদপসরণ করেছে। অতএব আর এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। কাজেই তাঁরা সেখান থেকে চলে এসে মাল-পত্র জমা করার কাজে লেগে গেলেন। সেখানে নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশের আনুগত্য ক'রে কেবল দশজন সাহাবী রয়ে গেলেন। এদিকে ঘাঁটি শূন্য পেয়ে কাফেরা উপকৃত হল। তাদের অশ্বারোহী দল মুসলিমদের পিছন থেকে পাল্টা আক্রমণ ক'রে বসল। অতর্কিতে এই আক্রমণের কারণে মুসলিমদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং তাঁরা স্বাভাবিকভাবে বহু কষ্টের শিকারও হলেন। এই আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, তোমাদের সাথে যা কিছু হয়েছে, তা নতুন কিছু নয়; পূর্বেও এ রকম হয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত ধ্বংস ও বরবাদী তাদের ভাগ্যেই নেমে আসে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

([৪৪]) বিগত যুদ্ধে তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য দমে যেও না এবং দুঃখও করো না। কেননা, তোমাদের মধ্যে যদি ঈমানী শক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহলে তোমরাই হবে বিজয়ী এবং তোমরাই লাভ করবে সফলতা। এখানে মহান আল্লাহ মুসলিমদের শক্তির প্রকৃত উৎস এবং তাঁদের সফলতার মূল ভিত্তি কোথায়, সে কথা পরিষ্কার ক'রে দিলেন। তাই তো এর পর যত যুদ্ধ হয়েছে, সেই সমূহ যুদ্ধে মুসলিমরা জয়লাভ করেছেন।

([৪৫]) এখানেও অন্য এক ভঙ্গিমায় মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, উহুদ যুদ্ধে তোমাদের কিছু লোক আহত হয়েছে তো কি হয়েছে? তোমাদের বিরোধী দলও তো বদরের যুদ্ধে এবং উহুদ যুদ্ধের প্রথম দিকে এইভাবেই আহত হয়েছিল। আর মহান আল্লাহ তাঁর হিকমতের দাবীতে হার-জিতের পালা পরিবর্তন করতে থাকেন। কখনো বিজয়ীকে পরাজিত করেন, আবার কখনো পরাজিতকে করেন বিজয়ী।

([৪৬]) উহুদ যুদ্ধে মুসলিমরা তাঁদের অবহেলার কারণে সাময়িকভাবে যে পরাজয়ের শিকার হন, তাতেও ভবিষ্যতের জন্য এমন কয়েকটি যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে, যা মহান আল্লাহ পরের আয়াতে বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ মহান আল্লাহ ঈমানদারদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক ক'রে দেখিয়ে দেন। (কারণ, ধৈর্য ও সুদৃঢ় থাকা ঈমানের দাবী।) যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে এবং মসীবতের সময় যাঁরা ধৈর্য ও সুদৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, অবশ্যই তাঁরা সকলেই মু'মিন। দ্বিতীয়তঃ কিছু লোককে শাহাদতের মর্যাদা দানে ধন্য করেন। তৃতীয়তঃ ঈমানদারদেরকে তাঁদের সমস্ত পাপ থেকে পবিত্র করেন। تَمْحِيْصٌ শব্দ কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়ঃ যেমন, বেছে নেওয়া এবং পবিত্র, পরিশুদ্ধ বা বিশুদ্ধ করা। আর পবিত্র ও পরিশুদ্ধ বলতে, পাপ থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* আর চতুর্থতঃ কাফেরদের ধ্বংস সাধন। কারণ, সাময়িকভাবে জয়লাভে তাদের অবাধ্যতা ও দাম্ভিকতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে এই জিনিসই তাদের ধ্বংস ও বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (١٤٢)

(১৪২) তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে,[৪৭] যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা না জানছেন![৪৮]

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (١٤٣)

(১৪৩) নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুর সম্মুখীন হবার পূর্বে তা কামনা করতে,[৪৯] এখন তোমরা তো তা স্বচক্ষে দেখলে?[৫০]

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ(١٤٤)

(১৪৪) মুহাম্মাদ রসূল ব্যতীত কিছু নয়,[৫১] তার পূর্বে বহু রসূল গত হয়ে গেছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয়, তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ যে পশ্চাদপসরণ করবে, সে কখনও আল্লাহর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।[৫২] আর অচিরেই আল্লাহ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে পুরস্কৃত করবেন।[৫৩]

([৪৭]) অর্থাৎ, বিনা যুদ্ধে এবং কোন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়েই তোমরা জান্নাতে চলে যাবে? না, বরং জান্নাত তারাই লাভ করবে, যারা (আল্লাহ কর্তৃক) পরীক্ষায় পূর্ণভাবে সফলতা অর্জন করবেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, [أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا] " তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমরা বেহেশ্ত প্রবেশ করবে; যদিও পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদের অবস্থা এখনো তোমরা প্রাপ্ত হওনি? দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-বালা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল---।" *(সূরা বাক্বারা ঃ ২১৪)* তিনি আরো বলেছেন, [أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ] "মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?" *(সূরা আনকাবুত ঃ ২)*

([৪৮]) এই বিষয়টি ইতিপূর্বে সূরা বাক্বারায় আলোচিত হয়েছে। এখানেও আলোচ্য-বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আবারও বর্ণনা ক'রে বলা হচ্ছে যে, জান্নাত এমনিতেই পেয়ে যাবে না। এর জন্য পরীক্ষার তেপান্তর অতিক্রম করতে হবে এবং জিহাদের ময়দানেও তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সেখানে দেখা হবে শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে থেকে তোমরা ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারছ, না পারছ না?

([৪৯]) এখানে সেই সাহাবীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে না পারার কারণে নিজেদের হৃদয়ে এক প্রকার বঞ্চনা-ব্যথা অনুভব করতেন এবং চাইতেন যে, আবারও যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হলে তাঁরাও কাফেরদের শিরশ্ছেদ ক'রে জিহাদের ফযীলত অর্জন করবেন। আর এই সাহাবীরাই উহুদের দিন জিহাদের উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন মুসলিমদের বিজয় কাফেরদের অভাবিত আক্রমণের ফলে পরাজয়ে পরিবর্তন হয়ে গেল (যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে হয়েছে), তখন জিহাদের উদ্দীপনায় ভরপুর যাঁদের অন্তর এমন মুজাহিদরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং অনেকে তো পলায়নও করেন। (পরে এর আলোচনা আসবে) অতঃপর অল্প সংখ্যক লোক দৃঢ়তার সাথে ময়দানে টিকে থাকেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* এই জন্যই হাদীসে এসেছে যে, "তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আশা করো না এবং আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা কর। তবে যদি শত্রুর সাথে মুখোমুখী হওয়ার পরিস্থিতি আপনা আপনিই এসে যায় এবং তোমাদেরকে তাদের সাথে লড়তে হয়, তাহলে তখন (ময়দানে) সুদৃঢ় ও অনড় থাকো। জেনে রাখো! জান্নাত হল তরবারির ছায়ার তলে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

([৫০]) رَأَيْتُمُوهُ এবং تَنْظُرُوْنَ উভয়ের অর্থ একই। অর্থাৎ, দেখা। সুনিশ্চয়তা ও আধিক্য বুঝানোর জন্য উভয় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তরবারির চমকে, বর্শা-বল্লমের তীক্ষ্ণতায়, তীরের আঘাতে এবং বীরদের সারিবদ্ধতায় তোমরা মৃত্যুকে খুব ভালোভাবে দর্শন করেছ। *(ইবনে কাসীর, ফাতহুল ক্বাদীর)*

([৫১]) 'মুহাম্মাদ একজন রসূল বৈ অন্য কিছুই নয়।' অর্থাৎ, রিসালাতের গুণে গুণান্বিত হওয়াই তাঁর বড় বৈশিষ্ট্য। তিনি মানব গুণের ঊর্ধ্বে নন এবং এমনও নন যে, তিনি আল্লাহর গুণের কোন কিছু প্রাপ্ত হয়েছেন ফলে তাঁকে মৃত্যু গ্রাস করবে না।

([৫২]) উহুদের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ এও ছিল যে, কাফেররা রটিয়ে দিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে। মুসলিমদের কাছে এ খবর পৌঁছলে, তাঁদের অনেকের মনোবল দমে যায় এবং তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ান। ফলে এই আয়াত অবতীর্ণ ক'রে বলা হয় যে, কাফেরদের হাতে নবী করীম ﷺ-এর হত্যা হওয়া এবং তাঁর উপর মৃত্যু আসা কোন নতুন কথা নয়। পূর্বের সকল নবীকেই নিহত হতে হয়েছে এবং মৃত্যু তাঁদেরকে গ্রাস করেছে। কাজেই নবী করীম ﷺও যদি মৃত্যুর হাতে ধরা পড়েন, তাহলে তোমরা কি দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যাবে? কিন্তু মনে রেখো! যে দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে, এতে আল্লাহর কোন কিছু এসে যাবে না। নবী করীম ﷺ-এর মর্মান্তিক মৃত্যুর সময় উমার ﷺ চরম উত্তেজনার শিকার হয়ে তাঁর মৃত্যুকে অস্বীকার করে বসেন। আবূ বাকর ﷺ বড়ই কৌশল অবলম্বন ক'রে রসূল ﷺ-এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে এই আয়াত তেলাঅত ক'রে শোনান। যাতে উমার ﷺ প্রভাবান্বিত হন এবং তাঁর অনুভব হয় যে, যেন এই আয়াত এখনই অবতীর্ণ হল।

([৫৩]) অর্থাৎ, যারা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে দৃঢ়পদ থেকে আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতার বাস্তব নমুনা পেশ করেছে।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَاباً مُؤَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (١٤٥)

(১৪৫) আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হবে না। কেননা, তার (মৃত্যুর) অবধারিত মিয়াদ লিখিত আছে। আর যে কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইবে, আমি তাকে তা হতে (কিছু) প্রদান করব এবং যে কেউ পারলৌকিক পুরস্কার চাইবে, আমি তাকে তা হতে প্রদান করব।[৫৪] আর শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করব।

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (١٤٦)

(১৪৬) কত নবী যুদ্ধ করেছেন। তাদের সাথে ছিল বহু রব্বানী (আল্লাহভক্ত) লোকও। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বলও হয়নি এবং নত হয়নি। বস্তুতঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন।[৫৫]

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (١٤٧)

(১৪৭) তাদের (মুখে) এ কথা ছাড়া আর অন্য কোন কথা ছিল না, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপরাশি এবং কর্মজীবনের বাড়াবাড়িসমূহকে তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।'

فَآتَاهُمُ اللهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٤٨)

(১৪৮) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার (বিজয়) এবং পারলৌকিক উত্তম পুরস্কার (বেহেশ্ত) দান করলেন। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (١٤٩)

(১৪৯) হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা অবিশ্বাসীদের অনুগত হও, তাহলে তারা তোমাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (١٥٠)

(১৫০) আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।[৫৬]

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (١٥١)

(১৫১) যারা অবিশ্বাস করে, তাদের হৃদয়ে আমি ভীতির সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করেছে; যার সপক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি।[৫৭] জাহান্নাম হবে তাদের নিবাস। আর অনাচারীদের আবাসস্থল অতি নিকৃষ্ট!

([৫৪]) দুর্বল ও ভীতু লোকদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য বলা হচ্ছে যে, মৃত্যু তো তার নির্দিষ্ট সময়ে আসবেই। অতএব পালিয়ে যাওয়ার ও ভীরুতা দেখানোর লাভ কি? অনুরূপ কেবল দুনিয়া চাইলে তা হয়ত পাওয়া যাবে, কিন্তু আখেরাতে কিছুই পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে যারা আখেরাত কামনা করে, তারা তো আখেরাতের নিয়ামত পাবেই, সেই সাথে তাদেরকে মহান আল্লাহ দুনিয়াও দান করেন। আরো বেশী উৎসাহিত করার এবং সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পরের আয়াতে পূর্বের নবীগণ এবং তাদের অনুসারীদের ধৈর্য ধরার এবং সুদৃঢ় থাকার দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে।

([৫৫]) অর্থাৎ, যুদ্ধের কঠিন পরিস্থিতিতেও তাঁরা মনোবল হারাতেন না এবং দুর্বলতার পরিচয় দিতেন না।

([৫৬]) পূর্বেও এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এখানে আবারও তার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। কারণ, উহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের সুযোগ গ্রহণ ক'রে কোন কোন কাফের অথবা মুনাফিক্ব মুসলিমদেরকে পরামর্শ দিচ্ছিল যে, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে এস। সুতরাং মুসলিমদেরকে বলা হল যে, কাফেরদের আনুগত্য করা হল ধ্বংস ও অনিষ্টের কারণ। সফলতা তো আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে এবং তাঁর চেয়ে উত্তম কোন সাহায্যকারী নেই।

([৫৭]) মুসলিমদের পরাজয় দেখে কোন কোন কাফেরের অন্তরে এই খেয়াল জন্মালো যে, মুসলিমদেরকে একেবারে নিঃশেষ ক'রে দেওয়ার এটা অতি উত্তম সুযোগ। ঠিক এই মুহূর্তে মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে মুসলিমদের ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। ফলে তারা নিজেদের পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার সাহস করতে পারেনি। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "আমাকে পাঁচটি এমন জিনিস দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। তার মধ্যে একটি হল, এক মাসের দূরত্বে অবস্থিত শত্রুর অন্তরে আমার ত্রাস (ভয়) ঢুকিয়ে দিয়ে আমার সাহায্য করা হয়েছে।" এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রসূল ﷺ-এর ভয় স্থায়ীভাবে শত্রুর অন্তরে ভরে দেওয়া হয়েছিল। আর এই আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, রসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর উম্মত অর্থাৎ, মুসলিমদের ভয়ও মুশরিকদের অন্তরে ভরে দেওয়া হয়েছে এবং তার কারণ হল, তাদের শির্ক। অর্থাৎ, শির্ককারীদের অন্তর সব সময় অন্যের ত্রাস ও ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। আর সম্ভবতঃ এই কারণেই মুসলিমদের এক বিরাট সংখ্যা শির্কী আক্বীদা ও আমলে জড়িয়ে পড়ার ফলে শত্রুরা তাদেরকে ভয় করে না, বরং তারাই শত্রুদের ভয় ও ত্রাসে ভীত-সন্ত্রস্ত।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (١٥٢)

(১৫২) আর আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন, যখন তোমরা তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশক্রমে হত্যা করছিলে।[৫৮] অবশেষে যখন তোমরা সাহস হারিয়েছিলে এবং (রসূলের) নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছিলে এবং যা তোমরা পছন্দ কর, তা[৫৯] (বিজয়) তোমাদেরকে দেখানোর পরে তোমরা অবাধ্য হয়েছিলে[৬০] (তখন বিজয় রহিত হল)। তোমাদের কতক লোক ইহকাল কামনা করেছিল[৬১] এবং কতক লোক পরকাল কামনা করেছিল।[৬২] অতঃপর তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি তোমাদেরকে তাদের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন।[৬৩] তবুও (কিন্তু) তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল।[৬৪]

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا

(১৫৩) (স্মরণ কর) তোমরা যখন (পাহাড়ের) উপরে চড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে[৬৫] এবং পিছনে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না; অথচ রসূল তোমাদেরকে পিছন থেকে আহবান করছিল।[৬৬] ফলে তিনি তোমাদেরকে দুঃখের উপর দুঃখ দিলেন;[৬৭] যাতে তোমরা যা

---

(৫৮) এই প্রতিশ্রুতির অর্থ কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে তিন হাজার এবং চার হাজার ফিরিশ্তার অবতরণ। কিন্তু এই মত একেবারে ভুল। কারণ ফিরিশ্তাদের অবতরণ তো বদর যুদ্ধের সাথে নির্দিষ্ট। সুতরাং এই আয়াতে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতির অর্থ হল, বিজয় ও সাহায্যের সেই সাধারণ প্রতিশ্রুতি, যা মুসলিমদের সাথে রসূল ﷺ-এর মাধ্যমে করা হয়েছিল। এমন কি কিছু আয়াত তো পূর্বে মক্কাতেই নাযিল হয়েছিল। আর এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (উহুদ) যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিমরা জয়যুক্তই ছিলেন। [إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ] (যখন তোমরা তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশক্রমে হত্যা করছিলে।) এই আয়াতে তারই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(৫৯) এর অর্থ ঃ সেই বিজয়, যা প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিমরা অর্জন করেছিলেন।

(৬০) মতভেদ সৃষ্টি করেছিলে এবং অবাধ্য হয়েছিলে বলতে, ৫০ জন তীরন্দাজের মধ্যে আপোসে মতভেদ সৃষ্টি হওয়াকে বুঝানো হয়েছে; যাতে তাঁরা সফলতা ও বিজয় দেখার পর লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর এরই কারণে কাফেররা পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েছিল।

(৬১) অর্থাৎ, গনীমতের মাল (যুদ্ধ-ময়দানে শত্রুপক্ষের ফেলে যাওয়া সম্পদ)। এরই কারণে তাঁরা পাহাড়ের সেই ঘাঁটি ছেড়ে চলে এসেছিলেন, যেখান থেকে নড়তে তাঁদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল।

(৬২) সেই লোক, যাঁরা ঘাঁটি ছাড়তে নিষেধ করেন এবং নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশ মত সেখানে অনড় থাকারই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(৬৩) অর্থাৎ, বিজয় দান করার পর পুনরায় পরাজয় দিয়ে তোমাদেরকে ঐ কাফেরদের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন কেবল তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য।

(৬৪) সাহাবায়ে কেরাম ﷺদের কর্মে ত্রুটি ও অবহেলা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তাঁদেরকে যে মর্যাদা-সম্মান দান করেছেন, সে কথাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁরা যাতে ভবিষ্যতে আর ভুল না করেন। তাই মহান আল্লাহ তাঁদের ভুলের কথা উল্লেখ ক'রে তাঁদের ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন। যাতে মন্দ অন্তরের লোকেরা তাঁদের ব্যাপারে কোন কটূক্তি না করতে পারে। কারণ, মহান আল্লাহই যখন কুরআনে কারীমে তাঁদের ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তখন অন্যের কি এ ব্যাপারে আর কোন নিন্দাপূর্ণ বাক্য ব্যবহার ও কটূক্তি করার অবকাশ থাকে? সহীহ বুখারীতে একটি ঘটনা উল্লেখ আছে যে, কোন এক হজ্জের সময় এক ব্যক্তি উষমান ﷺ-এর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করল। যেমন, তিনি বদর যুদ্ধে এবং বায়আতে রিযওয়ানে শরীক হননি এবং উহুদের যুদ্ধে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ইবনে উমার ﷺ (এই অভিযোগ খন্ডন ক'রে) বললেন, বদর যুদ্ধের সময় তাঁর স্ত্রী (রসূল ﷺ-এর কন্যা) অসুস্থ ছিলেন। বায়আতে রিযওয়ানে তিনি রসূল ﷺ-এর দূত হয়ে মক্কায় গিয়েছিলেন এবং উহুদের দিনে পালিয়ে যাওয়াকে তো আল্লাহ ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন। *(বুখারী, উহুদের যুদ্ধ পরিচ্ছেদ)*

(৬৫) কাফেরদের একাধারে হঠাৎ আক্রমণের ফলে মুসলিমদের মধ্যে যে ছত্রভঙ্গ অবস্থা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং তাঁদের অনেকেই যে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যান, এখানে সেই চিত্রই তুলে ধরা হচ্ছে। تُصْعِدُوْنَ ক্রিয়াপদ إِصْعَادٌ ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত। যার অর্থ হল, উপত্যকা বেয়ে (পাহাড়ে) চড়া কিংবা পালিয়ে যাওয়া।

(৬৬) নবী করীম ﷺ তাঁর কিছু সাথী সহ পিছনে ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে ডাক দিয়ে বলছিলেন, "আল্লাহর বান্দারা! আমার দিকে ফিরে এসো। আল্লাহর বান্দারা! আমার দিকে ফিরে এসো।" কিন্তু সেই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতে তাঁর এই ডাক কে শোনে?

(৬৭) সামান্য ত্রুটির কারণে তোমাদের উপর নেমে এল দুঃখের উপর দুঃখ। ইবনে জারীর এবং ইবনে কাষীরের নিকট প্রাধান্য প্রাপ্ত উক্তি অনুযায়ী প্রথম 'গাম্ম' (দুঃখ)এর অর্থ, গনীমতের মাল এবং কাফেরদের উপর বিজয় লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার 'গাম্ম' (দুঃখ)। আর দ্বিতীয় 'গাম্ম' (দুঃখ)এর অর্থ, মুসলিমদের শহীদ ও আহত হওয়ার 'গাম্ম' (দুঃখ) এবং নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশের বিরোধিতা ও তাঁর শহীদ হওয়ার মিথ্যা খবর থেকে সৃষ্ট দুঃখ।

فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥٣)

হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে, তার জন্য তোমার দুঃখিত না হও।[৬৮] আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لله يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٥٤)

(১৫৪) অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দুঃখের পর তন্দ্রারূপে নিরাপত্তা (ও শান্তি) প্রদান করলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল।[৬৯] আর একদল ছিল যারা নিজেদের জান নিয়েই ব্যস্ত ছিল।[৭০] প্রাগ্-ইসলামী অজ্ঞদের ন্যায় আল্লাহ সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করেছিল।[৭১] তারা বলেছিল যে, 'এ বিষয়ে আমাদের কি কোন এখতিয়ার আছে?'[৭২] বল, 'সমস্ত বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত।'[৭৩] তারা তাদের অন্তরে এমন কিছু গোপন রাখে, যা তোমার নিকট প্রকাশ করে না।[৭৪] তারা বলে, 'যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোন এখতিয়ার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।'[৭৫] বল, 'যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের ভাগ্যে অবধারিত ছিল, তারা নিজেদের বধ্যভূমিতে এসে উপস্থিত হত।'[৭৬] তা এ জন্য যে, যাতে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের হৃদয়ে যা (কালিমা) আছে, তা পরিশুদ্ধ করেন।[৭৭] আর অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ বিশেষভাবে অবহিত।[৭৮]

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ

(১৫৫) যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল।[৭৯] নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা

([৬৮]) অর্থাৎ, তোমাদের উপর দুঃখের উপর দুঃখ আপতিত হওয়ার কারণ হল, যাতে তোমাদের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার শক্তি এবং দৃঢ়সংকল্প ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

([৬৯]) উল্লিখিত চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির পর আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের উপর পুনরায় অনুগ্রহ করলেন এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধের ময়দানে অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁদের উপর তন্দ্রার ভাব সৃষ্টি করে দিলেন। আর এই তন্দ্রা (ঢুল) ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে প্রশান্তি এবং সাহায্যের দলীল। আবূ ত্বালহা ﷺ বলেন, আমিও তাঁদের একজন, যাঁদের উপর উহুদের দিন তন্দ্রার ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। এমন কি আমার তরবারি কয়েকবার আমার হাত থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, আর আমি ধরে নিয়েছিলাম। *(সহীহ বুখারী)* نُعَاسًا হল أَمَنَةً শব্দের বদল (পরিবর্ত শব্দ)। طَائِفَةٌ একবচন এবং বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([৭০]) এ থেকে মুনাফিক্বদেরকে বুঝানো হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, এ রকম কঠিন পরিস্থিতিতে তারা কেবল নিজেদের প্রাণ নিয়েই চিন্তিত ছিল।

([৭১]) যেমন ভাবত যে, নবী করীম ﷺ-এর সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই মিথ্যা। তিনি যে দ্বীনের প্রতি আহবান করেন, তার ভবিষ্যৎ আশঙ্কাজনক। তিনি তো আল্লাহর সহযোগিতা থেকেই বঞ্চিত ইত্যাদি ইত্যাদি।

([৭২]) অর্থাৎ, আমাদের জন্য কি আল্লাহর পক্ষ হতে আর কোন বিজয় ও সহযোগিতার সম্ভাবনা আছে? অথবা আমাদের কি কোন কথা চলতে পারে এবং মেনে নেওয়া যেতে পারে?

([৭৩]) তোমাদের কিংবা শত্রুদের এখতিয়ারে কিছুই নেই। সাহায্য-সহযোগিতা তাঁর পক্ষ থেকেই আসবে, সফলতা তিনিই দান করবেন এবং আদেশ-নিষেধ কেবল তাঁরই চলবে।

([৭৪]) নিজেদের অন্তরে মুনাফিক্বী গোপন রেখে ভাব এমন দেখাত যে, তারা পথ নির্দেশের মুখাপেক্ষী।

([৭৫]) এটা তারা আপোসে বলাবলি করত অথবা মনে মনে বলত।

([৭৬]) মহান আল্লাহ বললেন, এই ধরনের কথার লাভ কি? যেভাবেই হোক না কেন, মৃত্যু তো আসবেই এবং তা সেই স্থানেই আসবে, যেখানে আল্লাহর পক্ষ হতে লিখে দেওয়া হয়েছে। যদি তোমরা নিজেদের বাড়িতে অবস্থান কর, আর তোমাদের মৃত্যু কোন যুদ্ধের ময়দানে লিখা থাকে, তাহলে আল্লাহ কর্তৃক এই ফায়সালা তোমাদেরকে সেখানেই টেনে নিয়ে যাবে।

([৭৭]) (যুদ্ধের ময়দানে) যা কিছু ঘটেছে তার পিছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল, তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান ঈমানকে পরীক্ষা করা (যাতে মুনাফিক্বরা তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়) এবং তোমাদের অন্তঃকরণকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র করা।

([৭৮]) অর্থাৎ, খাঁটি মুসলিম কে এবং মুনাফিক্ব হয়ে বাহ্যিকভাবে ইসলামের পোশাক কে পরে আছে, তা তো তিনি জানেন। জিহাদের বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে এটাও একটি কৌশল যে, এতে মু'মিন ও মুনাফিক্বের প্রকৃত রূপ বিকশিত হয়ে সামনে চলে আসে; ফলে সাধারণ মানুষও তাদেরকে দেখে ও চিনে নিতে পারে।

([৭৯]) অর্থাৎ, উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি ঘটেছিল, তার কারণ ছিল তাঁদের পূর্বের কিছু দুর্বলতা। এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ ক'রে শয়তান এই দিন তাদের পদস্খলন ঘটাতে সফলকাম হয়েছিল। যেমন কোন কোন সলফের উক্তি হল,

করেছেন।[৮০] আল্লাহ অবশ্যই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٥٥)

(১৫৬) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা তাদের মত হয়ে যেও না, যারা অবিশ্বাস করে এবং যখন তাদের ভ্রাতাগণ পৃথিবীতে বিচরণ করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তারা তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের কাছে থাকত, তাহলে তারা মরত না এবং নিহত হত না।'[৮১] তা এ জন্য যে, যাতে আল্লাহ এটাকে তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন।[৮২] বস্তুতঃ আল্লাহই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(١٥٦)

(১৫৭) যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ কর, তাহলে তারা যা সঞ্চয় করে, তা থেকে উত্তম আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া।[৮৩]

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

(১৫৮) আর তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে, তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটেই একত্রিত করা হবে।

وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ (١٥٨)

(১৫৯) আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।[৮৪] আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।[৮৫] অতঃপর তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

'নেকীর প্রতিদান এটাও যে, তারপর আরো নেকী করার তাওফীক্ব লাভ হয় এবং পাপের প্রতিফল এটাও যে, তারপর আরো পাপের পথ খুলে যায় এবং সুগম হয়।'

(৮০) আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-দের ভুল-ত্রুটি এবং তার পরিণাম ও কৌশলগত দিক উল্লেখ ক'রে নিজের পক্ষ হতে তাঁদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করছেন। এ থেকে প্রথমতঃ প্রমাণ হয় যে, তাঁরা আল্লাহর অতিশয় প্রিয় ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ মু'মিনদের সতর্ক করা হচ্ছে যে, সত্যবাদী সেই মু'মিনদেরকে যখন স্বয়ং আল্লাহ ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন, তখন আর কারো জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে তাঁদেরকে তিরস্কার করবে অথবা তাঁদের ব্যাপারে কোন অন্যায় মন্তব্য বা কটূক্তি করবে।

(৮১) ঈমানদারদেরকে সেই বিভ্রান্তিকর আক্বীদা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে, যা কাফের ও মুনাফিক্বরা পোষণ করত। কারণ, এই বিশ্বাসই হল ভীরুতার মূল কারণ। পক্ষান্তরে যখন এই বিশ্বাস জন্মাবে যে, জীবন ও মরণ আল্লাহর হাতে এবং মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, তখন মানুষের মধ্যে সাহসিকতা এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার উৎসাহ সৃষ্টি হবে।

(৮২) যদি তারা যুদ্ধের ময়দানে না গিয়ে বাড়িতেই বসে থাকত, তাহলে মৃত্যুর কবলে পড়া থেকে বেঁচে যেত --এ রকম ভ্রান্ত আক্বীদা আন্তরিক অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, মৃত্যু তো সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরেও আসে। মহান আল্লাহ বলেন, [أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ] "তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরে অবস্থান কর তবুও।" *(সূরা নিসা ৭৮ আয়াত)* কাজেই এই অনুতাপ থেকে মুসলিমরাই রক্ষা পেতে পারে। কারণ, তাদের আক্বীদা সঠিক ও শুদ্ধ।

(৮৩) যে কোনভাবেই হোক না কেন মৃত্যু তো আসবেই, তাই এমন মৃত্যু যদি ভাগ্যে জুটে, যে মৃত্যুর পর মানুষ আল্লাহর ক্ষমা ও তাঁর দয়া লাভের যোগ্য হয়ে যায়, তবে এটা হবে তার জন্য পার্থিব সেই সমূহ ধন-সম্পদ থেকেও উত্তম, যা মানুষ সারা জীবন উপার্জন করে থাকে। কাজেই আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে পিছপা না হয়ে সেদিকে বড়ই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অগ্রসর হতে হবে। আর নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার উৎসাহ থাকলে তাঁর ক্ষমা ও দয়া সুনিশ্চিত হয়ে যাবে।

(৮৪) মহান নৈতিকতার অধিকারী নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর আল্লাহর কৃত অনুগ্রহসমূহের একটি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ ক'রে বলা হচ্ছে যে, তোমার মধ্যে যে কোমলতা ও নম্রতা তা আল্লাহর রহমতেরই ফল। আর দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য তো এই কোমলতার প্রয়োজন অনেক। তুমি যদি কোমল ও নরম না হয়ে কঠিন হৃদয়ের মালিক হতে, তাহলে মানুষ তোমার কাছে না এসে আরো দূরে সরে যেত। কাজেই তুমি মানুষের সাথে ব্যবহারে ক্ষমা ব্যবহার করতে থাক।

(৮৫) অর্থাৎ, মুসলিমদের মনস্তুষ্টির জন্য পরামর্শ করে নিবেন। এই আয়াত দ্বারা পরামর্শ করার গুরুত্ব, তার উপকারিতা এবং তার প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতা প্রমাণিত হয়। পরামর্শ করার এই নির্দেশ কারো নিকট ওয়াজিব এবং কারো নিকট মুস্তাহাব। *(ইবনে কাসীর)* ইমাম শওকানী লিখেছেন যে, 'শাসকদের জন্য অত্যাবশ্যক হল, তাঁরা এমন সব ব্যাপারে উলামাদের সাথে পরামর্শ করবেন, যে সব ব্যাপারে তাঁদের জ্ঞান নেই অথবা যে ব্যাপারে তাঁরা সমস্যায় পড়েন। সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন অফিসারদের সাথে সৈন্য সংক্রান্ত বিষয়ে, জনগণের দায়িত্বে নিয়োজিত নেতাদের সাথে জনসাধারণের কল্যাণ প্রসঙ্গে এবং

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

নির্ভর কর।[৮৬] নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন।

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ(١٦٠)

(১৬০) আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? এবং বিশ্বাসিগণের উচিত, কেবল আল্লাহরই উপর নির্ভর করা।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(١٦١)

(১৬১) কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, সে আত্মসাৎ করবে।[৮৭] আর যে কেউ কিছু আত্মসাৎ করবে, সে তার আত্মসাৎ করা বস্তু নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। অতঃপর (সেদিন) প্রত্যেকে যে যা অর্জন করেছে, তা পূর্ণ মাত্রায় প্রদত্ত হবে এবং তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦٢)

(১৬২) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, সে কি তার মত হতে পারে, যে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং যার বাসস্থান জাহান্নাম? আর তা নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٦٣)

(১৬৩) আল্লাহর নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ

(১৬৪) আল্লাহ অবশ্যই বিশ্বাসীদের প্রতি তাদের নিজেদের মধ্যে হতে রসূল প্রেরণ ক'রে অনুগ্রহ করেছেন।[৮৮] সে (নবী) তার

অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত সরকারী দায়িত্বশীলদের সাথে সেই অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরামর্শ করবেন।' ইবনে আত্বিয়্যাহ বলেন, 'এমন শাসকদের বরখাস্ত করার ব্যাপারে কোনই দ্বিমত নেই, যাঁরা আলেম ও দ্বীনদারদের সাথে কোন পরামর্শ করেন না।' আর এই পরামর্শ সেই সব বিষয়ের মধ্যেই সীমিত থাকবে, যে সব ব্যাপারে শরীয়ত নীরব (যে সম্বন্ধে শরীয়তের সুস্পষ্ট কোন সমাধান নেই) অথবা যার সম্পর্ক হল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সাথে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(৮৬) অর্থাৎ, পরামর্শ করার পর যে মতের উপর তোমার সংকল্প সৃষ্টি হবে, আল্লাহর উপর ভরসা ক'রে তা কার্যকরী করবে। এ থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, পরামর্শ করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ হবে শাসকের, পরামর্শদাতাদের অথবা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেদের হবে না, যেমন সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রে হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ ভরসা ও নির্ভর করতে হবে মহান আল্লাহর উপরে, পরামর্শদাতাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপরে নয়। পরের আয়াতেও আল্লাহর উপর ভরসা করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে।

(৮৭) উহুদ যুদ্ধের সময় যে তীরন্দাজরা ঘাঁটি ছেড়ে গনীমতের মাল একত্রিত করার জন্য চলে এসেছিলেন, তাঁদের ধারণা ছিল, আমরা যদি (মাল জমা করার জন্য) পৌঁছতে না পারি, তাহলে সমস্ত গনীমতের মাল অন্যরা নিয়ে নিবেন। তাই তাঁদেরকে চেতনা দেওয়া হচ্ছে যে, গনীমতের মালে তোমাদের কোন অংশ থাকবে না এ রকম ধারণা তোমরা কিভাবে করে নিলে? তোমাদের কি মহান নেতা মুহাম্মাদ ﷺ-এর আমানতদারী ও তাঁর বিশ্বস্ততার উপর ভরসা নেই? মনে রেখো, একজন নবীর দ্বারা কোন প্রকারের খেয়ানত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, খেয়ানত হল নবুঅত-পরিপন্থী জিনিস। যদি নবীই খেয়ানতকারী ও আত্মসাৎকারী হয়ে যান, তাহলে তাঁর নবুঅতের উপর বিশ্বাস কিভাবে করা যেতে পারে? খেয়ানত করা হল মহাপাপ; হাদীসসমূহে কঠোরভাবে তার নিন্দা করা হয়েছে।

(৮৮) নবীর মানুষ হওয়া এবং মানব-জাতিভুক্ত হওয়াকে মহান আল্লাহ একটি অনুগ্রহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর বাস্তবিকই এটা একটি মহা অনুগ্রহ। কারণ, প্রথমতঃ তিনি তাঁর জাতির স্থানীয় ভাষায় আল্লাহর পায়গাম পৌঁছাতে পারবেন যা বুঝা প্রত্যেক মানুষের জন্য সহজ হবে। দ্বিতীয়তঃ একই জাতিভুক্ত হওয়ার কারণে মানুষ তাঁর ঘনিষ্ঠ হবে এবং তাঁর কাছ ঘেঁসবে। তৃতীয়তঃ মানুষের জন্য মানুষ হওয়াটাই সব দিক দিয়ে সমীচীন। কেননা, মানুষের পক্ষে মানুষের অনুসরণ করা সম্ভব, কিন্তু তাদের পক্ষে ফিরিশ্তাদের অনুসরণ করা সম্ভব নয়। অনুরূপ ফিরিশ্তাকুল মানুষের আবেগ ও অনুভূতির গভীরতা ও সূক্ষ্মতা অনুধাবন করতে সক্ষম নন। কাজেই পয়গম্বর যদি ফিরিশ্তাদের মধ্য থেকে হতেন, তাহলে তিনি সেই সমূহ গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হতেন, যা দ্বীনের দাওয়াতের জন্য অতি প্রয়োজন। আর এই জন্যই দুনিয়াতে যত নবী এসেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন মানুষ। কুরআন তাঁদের মানুষ হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, [وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي] "তোমার পূর্বে আমি যতজনকে রসূল ক'রে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষ ছিল, তাদের প্রতি আমি অহী করেছি।" *(সূরা ইউসুফ ১০৯ আয়াত)* তিনি আরো বলেন, [وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ] "তোমার পূর্বে যত রসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য গ্রহণ করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত।" *(সূরা ফুরকান ২০ আয়াত)* অনুরূপ তিনি নবী করীম ﷺ-এর পবিত্র জবান দ্বারা ঘোষণা করলেন যে, [قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ] "বল, আমিও

أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ(١٦٤)

আয়াতগুলি তাদের নিকট আবৃত্তি ক'রে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা[৮৯] শিক্ষা দেয়। আর অবশ্যই[৯০] তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(١٦٥)

(১৬৫) যখন তোমাদের উপর (উহুদের যুদ্ধের বিপদ) এসেছিল, যার দ্বিগুণ বিপদ (বদরের যুদ্ধে) তোমরা তাদের উপর আনয়ন করেছিলে;[৯১] তখন তোমরা বলেছিলে, এ কোথা থেকে এল? বল, (হে মুহাম্মাদ!) এ তোমাদের নিজেদেরই কাছ থেকে।[৯২] নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (١٦٦)

(১৬৬) যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে ঘটেছিল। যাতে তিনি বিশ্বাসীদেরকে (ভালরূপে) জানতে পারেন।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (١٦٧)

(১৬৭) এবং মুনাফিক (কপটদের)কেও জানতে পারেন।[৯৩] আর তাদেরকে বলা হয়েছিল, এস, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরক্ষা কর। তারা বলেছিল, যদি আমরা যুদ্ধ জানতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম।[৯৪] সেদিন তারা বিশ্বাস (ঈমান) অপেক্ষা অবিশ্বাসের (কুফরীর) অধিক নিকটতম ছিল।[৯৫] যা তাদের অন্তরে নেই, তা তারা মুখে বলে।[৯৬] আর তারা যা গোপন রাখে, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।

তোমাদের মত একজন মানুষ আমার প্রতি অহী আসে।" *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৬ আয়াত)* বর্তমানে বহু মানুষ এই (রসূলের মানুষ হওয়া) বিষয়টিকে মানতে না পেরে বিপথগামী হয়েছে।

(৮৯) উক্ত আয়াতে নবী প্রেরণের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে। যথা, (ক) আয়াতের তেলাঅত ও আবৃত্তি, (খ) পবিত্র ও পরিশুদ্ধকরণ, (গ) এবং কিতাব ও হিকমতের কথা শিক্ষা দেওয়া। কিতাবের শিক্ষায় তেলাঅত আপনা আপনিই এসে যায়। তেলাঅতের সাথেই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। তেলাঅত ব্যতীত শিক্ষার কথা ভাবাই যায় না। তা সত্ত্বেও তেলাঅতকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল এ কথা পরিষ্কার করে দেওয়া যে, তেলাঅত করাও একটি পবিত্র ও সৎ কাজ, তাতে তেলাঅতকারী তার অর্থ বুঝুক বা না-ই বুঝুক। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কুরআনের অর্থ ও লক্ষ্য বুঝার চেষ্টা করা নিঃসন্দেহে একটি জরুরী বিষয়। তবুও তার অর্থ বুঝতে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত তা তেলাঅত করতে বৈমুখ থাকা বা তাতে অবহেলা প্রদর্শন করা বৈধ নয়। পবিত্রকরণ বলতে, আক্বীদা, আমল এবং নৈতিকতার সংশোধন। যেমন, নবী করীম ﷺ তাদেরকে শির্ক থেকে বের ক'রে তাওহীদের পথে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদনুরূপ নেহাতই হীন চরিত্র ও জঘন্য আচরণে আলিপ্ত জাতিকে উচ্চ নৈতিকতার অধিকারী ও মহান কর্ম সম্পাদনকারী জাতি হিসাবে গড়ে তুলেন। 'হিকমত' (প্রজ্ঞা)র অর্থ অধিকাংশ মুফাস্সিরের নিকট হাদীস।

(৯০) إِنْ এখানে الْمُثَقَّلَةِ থেকে مُخَفَّفَةٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, إِنَّ ছিল। এর অর্থ হল, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে।

(৯১) অর্থাৎ, উহুদ যুদ্ধে যেমন তোমাদের ৭০ জন লোক শহীদ হয়েছে, তেমনি বদর যুদ্ধে তোমরাও ৭০ জন কাফেরকে হত্যা এবং ৭০ জনকে বন্দী করেছিলে।

(৯২) অর্থাৎ, তোমাদের নিজেদেরই সেই ভুলের কারণে যা তোমরা রসূল ﷺ-এর পাহাড়ের ঘাঁটি ত্যাগ না করার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তা ত্যাগ করার মাধ্যমে করেছিলে। যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই হয়েছে। এই ভুলের কারণে কাফেরদের একটি দল সে ঘাঁটি হয়ে পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যায়।

(৯৩) অর্থাৎ, উহুদে তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা আল্লাহরই নির্দেশে হয়েছে। (যাতে তোমরা আগামীতে রসূল ﷺ-এর আনুগত্যের প্রতি যথাযথ যত্ন নাও।) এ ছাড়া এর আরো একটি উদ্দেশ্য হল, মু'মিন ও মুনাফিক্বদেরকে একে অপর থেকে পৃথক করা হল।

(৯৪) যুদ্ধ জানার অর্থ হল, যদি বাস্তবিকই তুমি যুদ্ধ করতে যেতে, তাহলে আমরাও তোমার সাথে থাকতাম। কিন্তু তুমি তো নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দিতে যাচ্ছ, অতএব এ রকম ভুল কাজে আমরা তোমার সাথে কিভাবে থাকতে পারি? এই ধরনের কথা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সাথীরা এই জন্যই বলেছিল যে, তাদের মত গ্রহণ করা হয়নি। আর এ কথা তারা তখন বলেছিল, যখন 'শাউত্ব' নামক স্থানে পৌঁছে তারা (যুদ্ধ না ক'রে) প্রত্যাবর্তন করছিল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম আনসারী তাদেরকে বুঝিয়ে যুদ্ধে শরীক করার প্রচেষ্টা করছিলেন। *(এর কিছু বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে হয়েছে।)*

(৯৫) নিজেদের মুনাফিক্বী এবং এমন কথা-বার্তার কারণে যা তারা বলেছে।

(৯৬) অর্থাৎ, যুদ্ধ ত্যাগ করার যে কারণ মৌখিকভাবে তারা প্রকাশ করেছে, সেটা প্রকৃত কারণ নয়, বরং তাদের অন্তরে লুক্কায়িত যে কারণ ছিল তা হল, প্রথমতঃ আমাদের পৃথক হওয়ায় মুসলিমদের অন্তরে দুর্বলতার সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়তঃ কাফেরদের লাভ হবে। অর্থাৎ, আসল উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম, মুসলিম এবং নবী করীম ﷺ-এর ক্ষতি করা।

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ(١٦٨)

(১৬৮) যারা (ঘরে) বসে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলত যে, তারা আমাদের কথা মত চললে নিহত হতো না। তাদেরকে বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর।[৯৭]

وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩)

(১৬৯) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত; তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে।[৯৮]

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠)

(১৭০) আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তারা আনন্দিত। এবং (যুদ্ধের সময়) তাদের পিছনের যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে;[৯৯] এ জন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٧١)

(১৭১) আল্লাহর (অনন্ত) নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তারা (বিশ্বাসিগণ) আনন্দ প্রকাশ করে[১০০] আর নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ

(১৭২) আঘাত পাওয়ার পরও যারা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং সাবধান হয়ে চলে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।[১০১]

([৯৭]) এখানে মুনাফিক্বদের কথা 'তারা আমাদের কথা মত চললে নিহত হতো না' এর প্রতিবাদ ক'রে মহান আল্লাহ বলছেন, "যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হও, তাহলে নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও তো দেখি।" অর্থাৎ, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য থেকে পালানোর কোন উপায় নেই। মৃত্যুও যেখানে এবং যেভাবে নির্ধারিত আছে, সেখানে এবং সেইভাবেই আসবে। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হতে পলায়ন কাউকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

([৯৮]) শহীদদের এ জীবন অবশ্যই প্রকৃতার্থে, রূপকার্থে নয়। তবে এ জীবনের সঠিক ধারণা দুনিয়াবাসীর নেই। (কুরআনে এটা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। দ্রষ্টব্যঃ সূরা বাক্বারাহ ঃ আয়াত নং১৫৪) কিন্তু এ জীবনের অর্থ কি? কেউ বলেছেন, কবরে তাঁদের আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে তাঁরা আল্লাহর নিয়ামত দ্বারা পরিতৃপ্ত হন। কেউ বলেছেন, জান্নাতের ফলের সুগন্ধি তাঁদের কাছে আসে, যার ফলে তাঁদের প্রাণ সব সময় সুবাসে ভরে থাকে। তবে হাদীস থেকে তৃতীয় আর একটি জিনিস যা জানা যায় --আর এটাই সঠিক-- তা হল, তাঁদের আত্মাসমূহকে সবুজ রঙের পাখির পেটে অথবা বুকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা জান্নাতে খেয়ে বেড়াতে এবং তার নিয়ামত দ্বারা তৃপ্তি লাভ করতে থাকবে। *(ফাতহুল ক্বাদীর, সহীহ মুসলিম)*

([৯৯]) অর্থাৎ, তাঁদের তিরোধানের পর যে মুসলিমরা জীবিত আছেন অথবা জিহাদে ব্যস্ত রয়েছেন, তাঁদের ব্যাপারে তাঁরা আশা প্রকাশ করবেন যে, তাঁরাও যদি শাহাদতের মর্যাদা লাভে ধন্য হয়ে এখানে আমাদের মত তৃপ্তিময় জীবন লাভ করতেন! উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ মহান আল্লাহর নিকট আরজি পেশ করলেন যে, আমাদের যে মুসলিম ভাইরা দুনিয়াতে জীবিত আছেন, তাঁদেরকে আমাদের অবস্থাসমূহ এবং আমাদের এই সুখেভরা জীবন সম্পর্কে কেউ অবহিত করানোর আছে কি? যাতে তাঁরা যেন যুদ্ধ ও জিহাদ করা থেকে বিমুখ না হয়। আল্লাহ তাআলা বললেন, "আমি তোমাদের এ কথা তাঁদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।" এই প্রসঙ্গেই মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন। *(মুসনাদ আহমাদ ১/৩৬৫-৩৬৬, সুনানে আবূ দাউদ, জিহাদ অধ্যায়)*

এ ছাড়াও আরো বহু হাদীস দ্বারা জিহাদের ফযীলত প্রমাণিত। যেমন, একটি হাদীসে এসেছে, "মৃত্যুবরণকারী কোন প্রাণই আল্লাহর নিকট উত্তম মর্যাদা লাভ করার পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, কিন্তু শহীদ শাহাদতের সুউচ্চ মর্যাদা দেখে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসতে পছন্দ করবে, যাতে সে আবারও আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হতে পারে।" *(মুসনাদ আহমদ ৩/১২৬, সহীহ মুসলিম ১৮৭৭নং)* জাবের ﷺ বলেন, একদা রসূল ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, "তুমি কি জানো যে, মহান আল্লাহ তোমার পিতাকে জীবিত ক'রে বলবেন, 'আমার কাছে তোমার কোন আশা প্রকাশ কর (যাতে আমি তা পূরণ করে দিই)।' তোমার পিতা উত্তরে বলবেন, 'আমার তো শুধু এটাই আশা যে, আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, যাতে আমি তোমার রাস্তায় মৃত্যুবরণ করতে পারি।' আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'এটা তো অসম্ভব। কারণ আমার অটল ফায়সালা হল, এখানে আসার পর পুনরায় দুনিয়াতে কেউ ফিরে যেতে পারবে না।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৩২৯০নং)*

([১০০]) এই আনন্দ ও প্রফুল্লতা প্রথম আনন্দের কথা সুদৃঢ় করণ এবং এ কথার বিবরণ যে, তাঁদের আনন্দ কেবল ভয়-ভীতি ও চিন্তা-ভাবনা না থাকার কারণে নয়, বরং তাঁদের আনন্দ আল্লাহর নিয়ামত এবং তাঁর সীমাহীন অনুগ্রহ লাভের কারণেও। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, প্রথম আনন্দের সম্পর্ক দুনিয়ায় অবস্থানরত ভাইদের সাথে এবং দ্বিতীয় আনন্দের কারণ হল তাঁদের উপর আল্লাহর কৃত অফুরন্ত অনুগ্রহ ও অতিশয় সম্মান। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([১০১]) যখন মুশরিকরা উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তখন পথিমধ্যে তাদের খেয়াল হয় যে, আমরা তো একটি সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট ক'রে দিলাম। পরাজয়ের কারণে মুসলিমদের মনোবল তো দমে গেছে এবং তারা এখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং

الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٧٢)

(১৭৩) যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ (কথা) তাদের বিশ্বাস বর্ধিত করেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।[১০২]

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣)

(১৭৪) তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল,[১০৩] কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হন, তারা তারই অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (١٧٤)

(১৭৫) ঐ (বক্তা) তো শয়তান; যে (তোমাদেরকে) তার (কাফের) বন্ধুদের ভয় দেখায়;[১০৪] সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর।[১০৫]

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧٥)

(১৭৬) আর যারা দ্রুতগতিতে অবিশ্বাস করে, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তারা নিশ্চয় আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ পরকালে তাদেরকে কোন অংশ দেওয়ার

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ

এই সুযোগ গ্রহণ ক'রে আমাদের উচিত ছিল, মদীনার উপর পুরোদমে আক্রমণ ক'রে বসা, যাতে মদীনা ভূমি থেকে ইসলাম সমূলে উচ্ছেদ হয়ে যেত। এদিকে মদীনায় পৌঁছে নবী করীম ﷺও তাদের (কাফেরদের) পুনরায় পাল্টা আক্রমণের আশঙ্কা বোধ করলেন। তাই তিনি সাহাবাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেন। সাহাবায়ে কেরাম ﷺ যদিও নিজেদের নিহত ও আহতদের কারণে বড়ই মর্মাহত ও দুঃখিত ছিলেন, তবুও নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশ মত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মুসলিমদের এই দল যখন মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে পৌঁছল, তখন মুশরিকরা ভয় পেয়ে গেল। কাজেই তাদের ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটল এবং মদীনার উপর আক্রমণ করার পরিবর্তে মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করল। অতঃপর নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাথীরাও মদীনায় প্রত্যাগমন করলেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করার উদ্দীপনার উপর মুসলিমদের প্রশংসা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হল, আবূ সুফিয়ানের ধমক ও হুমকি। সে হুমকি দিয়েছিল যে, আগামী বছর 'বদ্‌র সুগরা'য় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মোকাবেলা হবে। (আবূ সুফিয়ান তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি) তার এই হুমকির ভিত্তিতে মুসলিমরাও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করার পূর্ণ উৎসাহ প্রদর্শন ক'রে জিহাদে পুরো দমে অংশ গ্রহণ করার দৃঢ় সংকল্প করেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর ও ইবনে কাসীর থেকে সংগৃহীত সার-সংক্ষেপ। তবে শেষোক্ত কথাটি আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়)*

([১০২]) 'হামরাউল আসাদ' এবং বলা হয় যে, 'বদ্‌র সুগরা'র সময়ে আবূ সুফিয়ান মালের বিনিময়ে কিছু মানুষের খিদমত গ্রহণ করে। সে তাদের মাধ্যমে গুজব রটায় যে, মক্কার মুশরিকগণ যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তার (আবূ সুফিয়ানের) উদ্দেশ্য ছিল, এ খবর শুনে মুসলিমদের উৎসাহ-উদ্দীপনা হ্রাস পাবে। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ নাকি শয়তান তার সহচরদের দিয়ে করিয়েছিল। তবে এই ধরনের গুজব শুনে ভয় পাওয়ার পরিবর্তে মুসলিমদের উৎসাহ ও সংকল্প আরো বেড়ে যায়। যেটাকে এখানে (আয়াতে) 'ঈমান ও বিশ্বাস বর্ধিত করেছিল' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা ঈমান যত বলিষ্ঠ হবে, জিহাদের উদ্দীপনা ও সংকল্প ততই বৃদ্ধি পাবে। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈমান জমাট ধরনের কোন জিনিস নয়, বরং তাতে কম-বেশী হতে থাকে। আর এটাই হল মুহাদ্দিসগণের মত। অনুরূপ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, পরীক্ষা ও বিপদের সময় মু'মিনদের নীতি হল, আল্লাহর উপর ভরসা করা। আর এই কারণেই হাদীসে حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ পড়ার অনেক ফযীলত এসেছে। সহীহ বুখারী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে এসেছে যে, যখন ইব্রাহীম ﷺ-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তাঁর জবান দ্বারা এই (হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল) শব্দই উচ্চারিত হয়েছিল। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([১০৩]) نِعْمَةٌ (নিয়ামত)এর অর্থ নিরাপত্তা ও শান্তি। আর فَضْلٌ (অনুগ্রহ)এর অর্থ সেই মুনাফা যা 'বদ্‌র সুগরা'য় ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল। নবী করীম ﷺ 'বদ্‌র সুগরা' হয়ে গমনকারী এক বাণিজ্য-কাফেলার নিকট থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় ক'রে বিক্রি করেছিলেন, যা থেকে মুনাফা হয়েছিল এবং তা তিনি মুসলিমদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছিলেন। *(ইবনে কাসীর)*

([১০৪]) অর্থাৎ, তোমাদের মনের মধ্যে এই কল্পনা ও ধারণা সৃষ্টি করে যে, তারা বড়ই সুদৃঢ় ও অতীব শক্তিশালী।

([১০৫]) অর্থাৎ, যখন সে তোমাদের মধ্যে এই ধরনের ধারণায় পতিত করবে, তখন তোমরা কেবল আমারই উপর ভরসা রাখবে এবং আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। আমিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হব এবং তোমাদের সাহায্য করব। যেমন অন্যত্র তিনি বলেছেন, [أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ] "আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?" *(সূরা যুমার ৩৬ আয়াত)* তিনি আরো বলেন, [كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي] অর্থাৎ, আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। *(সূরা মুজাদালাহ ২১)* এ বিষয়ে এ ছাড়া আরো বহু আয়াত রয়েছে।

ইচ্ছা করেন না।[১০৬] আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٧٦)

(১৭৭) যারা বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাস ক্রয় করেছে, তারা কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٧)

(১৭৮) অবিশ্বাসিগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি তাদেরকে যে সুযোগ দিয়েছি, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ আমি তাদেরকে এ জন্য সুযোগ দিয়েছি যে, যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়।[১০৭] আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٧٨)

(১৭৯) অপবিত্র (মুনাফিক)কে পবিত্র (মু'মিন) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ, আল্লাহ সে অবস্থায় বিশ্বাসিগণকে ছেড়ে দিতে পারেন না।[১০৮] অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা আল্লাহর (নিয়ম) নয়।[১০৯] অবশ্য (তার জন্য) আল্লাহ তাঁর রসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।[১১০] সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বিশ্বাস কর। বস্তুতঃ তোমরা বিশ্বাস করলে ও সাবধান (পরহেযগার) হয়ে

مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٧٩)

---

(১০৬) রসূল ﷺ-এর মধ্যে এই আশা চরমভাবে বিদ্যমান ছিল যে, সমস্ত মানুষ মুসলিম হয়ে যাক। আর এরই কারণে তাদের অস্বীকার করায় ও মিথ্যা ভাবায় তিনি বড়ই কষ্টবোধ করতেন। তাই মহান আল্লাহ এই আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, তুমি কোন চিন্তা ও দুঃখ করবে না। এরা আল্লাহর কিছুই করতে পারবে না, তারা তো কেবল নিজেদের আখেরাত নষ্ট করছে।

(১০৭) এই আয়াতে আল্লাহর সুযোগ ও অবসর দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা স্বীয় কৌশল ও ইচ্ছা অনুযায়ী কাফেরদেরকে সুযোগ ও অবসর দেন। সাময়িকভাবে তাদেরকে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিজয় এবং মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততি দান করেন। মানুষ মনে করে যে তাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ হচ্ছে, কিন্তু আল্লাহর যাবতীয় নিয়ামত দ্বারা যারা উপকৃত হয়, তারা যদি নেকী ও আল্লাহর আনুগত্যের রাস্তা অবলম্বন না করে, তাহলে দুনিয়ার এই সমস্ত নিয়ামত তাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ হবে না, বরং তা হবে তাঁর দেওয়া অবসর। এর দ্বারা তাদের কুফরী ও পাপ আরো বর্ধিত হতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা জাহান্নামের চিরন্তন আযাবের উপযুক্ত বিবেচিত হবে। এই বিষয়টাকে মহান আল্লাহ কুরআনের আরো কয়েকটি স্থানে উল্লেখ করেছেন। যেমন, [أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ] "তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি, তার দ্বারা তাদের জন্যে সর্বপ্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা বুঝে না।" *(সূরা মু'মিনূন ঃ ৫৫-৫৬)*

(১০৮) এই জন্যই মহান আল্লাহ পরীক্ষার কষ্টিপাথরে ঘষে নেন, যাতে তাঁর প্রকৃত বন্ধু কে তা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তাঁর শত্রু লাঞ্ছিত হয়। আর ধৈর্যশীল মু'মিন মুনাফিক্ব থেকে পৃথক হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা উহুদের দিন ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা করেছিলেন। সেদিন ঈমানদারগণ তাঁদের ঈমান, ধৈর্য, সুদৃঢ়তা এবং আনুগত্যের চরম উদ্দীপনার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেশ করেছিলেন এবং মুনাফিক্বরা নিজেদেরকে মুনাফিক্বীর যে পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, সে পর্দা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

(১০৯) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যদি এইভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষদের অবস্থাসমূহ এবং তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহকে প্রকাশ না করে দেন, তাহলে তোমাদের নিকট তো এমন কোন গায়বী জ্ঞান নেই, যার দ্বারা তোমাদের নিকট এই জিনিসগুলো প্রকাশ হয়ে যাবে এবং তোমরা জানতে পারবে যে, মুনাফিক্ব কে এবং খাঁটি মু'মিন কে?

(১১০) অবশ্য মহান আল্লাহ তাঁর মনোনীত রসূলগণের মধ্য থেকে যাঁকে চান, তাঁকে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত করেন। ফলে তাঁদের নিকট মুনাফিক্বদের যাবতীয় অবস্থা এবং তাদের সমূহ চক্রান্তের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, তা কখনো কখনো কোন কোন নবীর জন্য প্রকাশ করা হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক নবী (যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা না চান) মুনাফিক্বদের আভ্যন্তরিক মুনাফিক্বী এবং তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞই থাকেন। (যেমন, সূরা তাওবার ১০১নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, "আর কিছু কিছু তোমার আশে-পাশের মুনাফিক্ব এবং কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর মুনাফিক্বীতে অনড়। তুমি তাদেরকে জান না, আমি তাদেরকে জানি।) এর অর্থ এও হতে পারে যে, আমি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কেবল আমার রসূলগণকেই অবহিত করি। কারণ, তাঁদের (নবুঅতী) পদের জন্য এটা জরুরী। এই আল্লাহর অহী এবং অদৃশ্য বিষয় দ্বারা তাঁরা মানুষদেরকে আল্লাহর প্রতি আহবান করেন এবং নিজেদেরকে আল্লাহর রসূল বলে সাব্যস্ত করেন। এই বিষয়টাকে অন্যত্র এইভাবে বলা হয়েছে, [عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ] "তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারোও কাছে প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত।" *(সূরা জিন ঃ ২৬-২৭)* প্রকাশ থাকে যে, অদৃশ্য বিষয় বলতে সেগুলোকে বোঝানো হয়েছে, যা রিসালাতের পদ এবং তার দায়িত্ব পালনের সাথে সম্পর্কিত। তা অতীত ঘটিত এবং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত ঘটিতব্য বিষয়ের জ্ঞান নয়। যেমন, অনেক বাতিলপন্থী মনে করে ও করায় যে, আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এবং তাদের কিছু 'নিষ্পাপ' ইমামরা নাকি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতেন।

চললে, তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١٨٠)

(১৮০) এবং তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আল্লাহ তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তাতে কৃপণতা করলে, তাতে তাদের মঙ্গল আছে। বরং এ (কৃপণতা) তাদের জন্য অমঙ্গল। তারা যে ধনে কৃপণতা করে, কিয়ামতের দিন ঐটিই তাদের গলার বেড়ি হবে।[১১১] আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চরম স্বত্বাধিকার কেবল আল্লাহরই। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত।

لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (١٨١)

(১৮১) আল্লাহ অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে, আল্লাহ অভাবগ্রস্ত ও আমরা অভাবমুক্ত![১১২] তারা যা বলেছে তা এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখব[১১৩] এবং বলব, তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর।

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ(١٨٢)

(১৮২) এ তোমাদের হস্ত যা পূর্বে পাঠিয়েছে (অর্থাৎ, তোমাদের কৃত কর্মের ফল) এবং নিশ্চয় আল্লাহ দাসদের প্রতি অত্যাচারী নন।

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٨٣)

(১৮৩) যারা বলে, আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে (এমন) কুরবানী না করবে, যাকে অগ্নি (অদৃশ্য হতে এসে) গ্রাস করবে। (হে নবী!) তাদেরকে তুমি বল, আমার পূর্বে অনেক রসূল স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তোমরা যা বলছ, তা সহ তোমাদের নিকট এসেছিল; যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে?[১১৪]

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا

(১৮৪) অতঃপর তারা যদি তোমাকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তবে তোমার পূর্বে যেসব রসূল স্পষ্ট নিদর্শনাবলী, অবতীর্ণ সহীফাসমূহ এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিল, তাদেরকেও তো মিথ্যাজ্ঞান

---

(১১১) এই আয়াতে এমন কৃপণের কথা বলা হচ্ছে, যে আল্লাহর দেওয়া সম্পদ তাঁর রাস্তায় ব্যয় করে না। এমন কি সেই মালের ওয়াজেব যাকাতও আদায় করে না। সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে যে, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-মাল দান করেছেন, কিন্তু সে ব্যক্তি তার সেই ধন-মালের যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তা (আযাবের) জন্য তার সমস্ত ধন-মালকে একটি মাথায় টাক পড়া (অতিরিক্ত বিষাক্ত) সাপের আকৃতি দান করা হবে; যার চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। সেই সাপকে বেড়ির মত তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সে তার উভয় কশে ধারণ (দংশন) ক'রে বলবে, 'আমি তোমার মাল, আমি তোমার সেই সঞ্চিত ধনভান্ডার।' *(বুখারী ১৪০৩নং)*

(১১২) যখন মহান আল্লাহ ঈমানদারদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার উৎসাহ দান ক'রে বললেন যে, [مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً] "কে আছে এমন, যে ঋণ দেবে আল্লাহকে উত্তম ঋণ।" *(সূরা বাক্বারাহ ২৪৫, সূরা হাদীদ ১১)* তখন ইয়াহুদীরা বলল, তোমার প্রতিপালক এমন অভাবগ্রস্ত যে, স্বীয় বান্দাদের কাছ থেকে ঋণ চাচ্ছেন? এই কথারই ভিত্তিতে মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন। *(ইবনে কাসীর)*

(১১৩) অর্থাৎ, পূর্বে উল্লেখিত আল্লাহর শানে বেআদবীমূলক উক্তি এবং তাদের (পূর্বপুরুষদের) অন্যায়ভাবে আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)দের হত্যা ইত্যাদি তাদের যাবতীয় পাপ আল্লাহর নিকট লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই পাপের কারণেই তারা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে।

(১১৪) এই আয়াতে ইয়াহুদীদের আর একটি কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছে; তারা বলতো যে, মহান আল্লাহ আমাদের নিকট থেকে এই প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন যে, তোমরা কেবল সেই রসূলকেই বিশ্বাস করবে, যাঁর দুআর ফলে আসমান থেকে আগুন এসে কুরবানী ও সাদক্বাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ! তোমার দ্বারা যেহেতু এই মু'জিযা সংঘটিত হয়নি, তাই আল্লাহর নির্দেশের ভিত্তিতে তোমার রিসালাতের উপর ঈমান আনা আমাদের জন্য জরুরী নয়। অথচ পূর্বের নবীদের মধ্যে এমন নবীও এসেছেন, যাঁর দুআয় আসমান থেকে আগুন এসে ঈমানদারদের সাদক্বা ও কুরবানী জ্বালিয়ে দিত। এর দ্বারা প্রথমতঃ প্রমাণিত হত যে, আল্লাহর রাস্তায় পেশ করা সাদক্বা ও কুরবানী আল্লাহর নিকট কবুল হয়েছে। আর দ্বিতীয়তঃ প্রমাণ হত যে, নবী সত্য। তবে ইয়াহুদীরা এই নবী ও রসূলদেরকে মিথ্যুকই ভেবেছে। তাই মহান আল্লাহ বললেন, "যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহলে তোমরা এমন নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কেন করলে এবং তাঁদেরকে হত্যাই বা কেন করলে, যাঁরা তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন।"

করা হয়েছিল।[১১৫]

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (١٨٤)

(১৮৫) জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশ্তে প্রবেশলাভ করবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।[১১৬]

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (١٨٥)

(১৮৬) (হে বিশ্বাসিগণ!) নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে।[১১৭] আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের এবং অংশীবাদী (মুশরিক)দের কাছ থেকে অবশ্যই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। সুতরাং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সংযমী হও, তাহলে তা হবে দৃঢ়সংকল্পের কাজ।[১১৮]

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ(١٨٦)

(১৮৭) (স্মরণ কর) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা তা (কিতাব) স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এর পরও তারা তা পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) ও তা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا

([১১৫]) নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, তুমি ইয়াহুদীদের অসার কাট-হুজ্জতির কারণে দুঃখিত হবে না। কারণ, এই ধরনের আচরণ তারা যে কেবল তোমার সাথেই করছে তা নয়, বরং তোমার পূর্বে আগত নবীদের সাথেও এই ধরনের আচরণ করা হয়েছে।

([১১৬]) এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ মৃত্যু এমন ধ্রুব সত্য বিষয় যে, তা থেকে নিষ্কৃতির কোন পথ নেই। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়াতে ভাল-মন্দ যে যা-ই করুক না কেন, তাকে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান পরকালে দেওয়া হবে। তৃতীয়তঃ প্রকৃত সফলতা সেই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, যে দুনিয়াতে থাকাকালীন স্বীয় প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে নিয়েছে এবং যার ফল স্বরূপ তাকে জাহান্নাম থেকে দূর ক'রে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। চতুর্থতঃ পার্থিব জীবন হল ধোঁকার সম্পদ। এই ধোঁকা থেকে যে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারবে, সেই হবে ভাগ্যবান। আর যে এই ধোঁকার জালে ফেঁসে যাবে, সেই হবে ব্যর্থ ও হতভাগা।

([১১৭]) ঈমানদারদেরকে তাদের ঈমান অনুযায়ী পরীক্ষা করার কথা আলোচিত হয়েছে। সূরা বাক্বারার ১৫৫নং আয়াতেও এই ধরনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই আয়াতের তফসীরে একটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। তা হল, মুনাফিক্বদের সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তখনও (বাহ্যিক) ইসলাম প্রকাশ করেনি এবং বদরের যুদ্ধও তখন পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি। এমন এক দিনে নবী করীম ﷺ (রোগাক্রান্ত) সা'দ ইবনে উবাদা ﷺ-কে দেখার জন্য বানী-হারেষ ইবনে খাযরাজে গেলেন। পথে এক মজলিসে কিছু মুশরিক, ইয়াহুদী এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই প্রভৃতি বসেছিল। রসূল ﷺ-এর সওয়ারীর পায়ের উড়ন্ত ধুলো তাদের গায়ে লাগলে তারা ক্ষুব্ধ ভাব প্রকাশ করল। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াতও দিলেন। ফলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বেআদবীমূলক বাক্যও ব্যবহার করল। সেখানে কিছু মুসলিমও ছিলেন। তাঁরা তাদের বিপরীত রসূল ﷺ-এর প্রশংসা করলেন। তাদের উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বেধে যাওয়ার উপক্রম হলে তিনি তাদেরকে থামালেন। অতঃপর তিনি সা'দ ﷺ-এর কাছে পৌঁছে তাঁকে এ ঘটনা শুনান। শুনে সা'দ ﷺ বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এই ধরনের কথা বলার কারণ হল, আপনার মদীনা আগমনের পূর্বে এখানের বাসিন্দারা তার মাথায় মুকুট পরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু আপনার আগমনে তার এই সুন্দর স্বপ্ন অবাস্তব রয়ে গেল। এতে সে চরমভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তার এই ধরনের কথাগুলো উক্ত কারণঘটিত বিদ্বেষ ও ঔদ্ধত্যেরই বহিঃপ্রকাশ। কাজেই আপনি ক্ষমাশীলতা প্রয়োগ করুন। *(সহীহ বুখারী থেকে সংগৃহীত সার-সংক্ষেপ)*

([১১৮]) 'তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল' বলতে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের বুঝানো হয়েছে। এরা বিভিন্নভাবে নবী করীম ﷺ, ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিন্দা গেয়ে বেড়াত। মুশরিকদের অবস্থাও অনুরূপ ছিল। এ ছাড়াও মদীনা আসার পর মুনাফিক্বগণ বিশেষতঃ তাদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই রসূল ﷺ-এর ব্যাপারে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ক'রে বেড়াত। রসূল ﷺ-এর মদীনা আসার পূর্বে মদীনাবাসীরা তাদের সর্দারের মাথায় সর্দারীর মুকুট পরানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ক'রে নিয়েছিল। রসূল ﷺ-এর আগমনের কারণে তার এই স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এতে সে চরমভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হল। তাই প্রতিশোধ গ্রহণ করার নিমিত্তেও এই লোকটি রসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে গালিগালাজ করার কোন সুযোগ পেলে, তা হাত ছাড়া করে না। (যেমন, পূর্বের টীকায় বুখারীর হাওয়ালায় এই ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।) এই রকম পরিস্থিতিতে মুসলিমদেরকে ক্ষমা, ধৈর্য এবং আল্লাহভীরুতার পথ অবলম্বন করার কথা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সত্যের প্রতি আহবায়কদের বহু কষ্ট ও কঠিন সমস্যার শিকার হওয়ার বিষয়টা সত্য পথের নানা পর্যায়ে স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এর চিকিৎসা ঃ ধৈর্য ধারণ, আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন বৈ আর কিছুই নয়। *(ইবনে কাসীর)*

بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (١٨٧)

নিকৃষ্ট।[১১৯]

لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨٨)

(১৮৮) যারা নিজেরা যা করেছে, তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা করেনি, এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে, এরূপ তুমি কখনও মনে করো না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[১২০]

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٨٩)

(১৮৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ (١٩٠)

(১৯০) নিশ্চয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[১২১]

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا

(১৯১) যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।[১২২]

([১১৯]) এখানে আহলে-কিতাবদেরকে তিরস্কার করা হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে মহান আল্লাহ এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তাঁর কিতাবে (তাওরাত ও ইঞ্জীলে) যে কথাগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং শেষ নবীর যে গুণাবলী তাতে উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলো তারা মানুষের কাছে বর্ণনা করবে ও তার কোন কিছুই গোপন করবে না। কিন্তু তারা সামান্য পার্থিব স্বার্থের কারণে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলে। অর্থাৎ, আলেম সমাজকে জ্ঞাত ও সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁদের নিকট উপকারী যে জ্ঞান রয়েছে, যে জ্ঞান দ্বারা মানুষের যাবতীয় আক্বীদা ও আমলের সংশোধন হওয়া সম্ভব, সে জ্ঞান যেন তাঁরা মানুষের নিকট অবশ্যই পৌঁছে দেন। পার্থিব স্বার্থ ও লাভের খাতিরে তা গোপন করা হবে অতি বড় অপরাধ। কিয়ামতের দিন এই ধরনের আলেমকে আগুনের লাগাম পরানো হবে। *(এ কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।)*

([১২০]) আলোচ্য আয়াতে এমন লোকদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে, যারা কেবল তাদের বাস্তব কৃতিত্ব নিয়েই খোশ নয়, বরং তারা চায় যে, তাদের খাতায় এমন কৃতিত্বও লেখা হোক বা প্রকাশ করা হোক, যা তারা করেনি। এই রোগ যেরূপ রসূল ﷺ-এর যুগে ছিল এবং যার কারণে আয়াত নাযিল হয়, অনুরূপ বর্তমানেও পদাভিলাষী ও যশান্বেষী প্রকৃতির মানুষের মধ্যে এবং প্রোপাগান্ডা ও আরো বিভিন্ন চালাকী ও চাতুর্যের মাধ্যমে নেতৃত্ব লাভকারী নেতাদের মধ্যেও ব্যাপকহারে এ রোগ পাওয়া যায়। আয়াতের প্রসঙ্গসূত্র থেকে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহুদীরা আল্লাহর কিতাবে পরিবর্তন ও তা গোপন করার অপরাধে অপরাধী ছিল এবং তারা তাদের এই কুকৃতিত্বে আনন্দিতও ছিল। বর্তমানের বাতিলপন্থীদের অবস্থাও অনুরূপ। তারাও মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট ক'রে, ভুলপথ প্রদর্শন ক'রে এবং আল্লাহর আয়াতের অর্থগত পরিবর্তন ও অস্পষ্ট ব্যাখ্যা ক'রে বড়ই আনন্দবোধ করে এবং দাবী করে যে, তারাই হক্বপন্থী ও তাদেরকে তাদের এই প্রতারণার জন্য সাবাসীও দেওয়া হোক।-

قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُوْنَ-

([১২১]) অর্থাৎ, যাঁরা আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং বিশ্ব-জাহানের অন্যান্য রহস্য এবং গুপ্তবিষয় সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেন, তাঁরা বিশ্বের স্রষ্টা এবং তার পরিচালকের পরিচয় অর্জন করতে সক্ষম হন এবং তাঁরা জেনে যান যে, বিশাল এই পৃথিবীর সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা --যাতে সামান্য পরিমাণও কোন বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না-- অবশ্যই তার পিছনে এমন কোন সত্তা আছে যে তা সূক্ষ্মভাবে পরিচালনা করছে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করছে। আর সে সত্তা হল আল্লাহর সত্তা। পরের আয়াতে এই জ্ঞানীজনদের গুণাবলী উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে যে, তাঁরা দাঁড়িয়ে-বসে এবং শয়ন অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করেন।---হাদীসে বর্ণিত যে, ১৯০নং আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো নবী করীম ﷺ যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য উঠতেন, তখন পড়তেন এবং তারপর ওযূ করতেন। *(বুখারী ৪৫৬৯-মুসলিম ২৫৬নং)*

([১২২]) এই দশটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের কিছু নিদর্শন বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এগুলো নির্দশন অবশ্যই, তবে কার জন্যে? জ্ঞানীদের জন্যে। এর অর্থ হল, বিস্ময়কর এই সৃষ্টি এবং আল্লাহর মহা কুদরত দেখেও যে ব্যক্তি মহান স্রষ্টার পরিচয় লাভ করতে পারে না, সে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানীই নয়। কিন্তু বড় আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল যে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্বেও 'জ্ঞানী' (বিজ্ঞানী) তাকেই মনে করা হয়, যে মহান আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহের শিকার। فَإِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ- দ্বিতীয় আয়াতে জ্ঞানীদের আল্লাহর যিক্র করার স্পৃহা এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁদের চিন্তা ও গবেষণা করার কথা বর্ণিত হয়েছে। হাদীসেও রসূল ﷺ বলেছেন, "দাঁড়িয়ে নামায পড়। যদি দাঁড়িয়ে পড়তে না পার, তাহলে বসে বসে পড়। আর যদি বসে বসে পড়তে না পার, তবে পার্শ্বদেশে শুয়ে শুয়ে পড়।" *(বুখারী ১১১৭নং)* এই ধরনের লোক যাঁরা সব সময় আল্লাহর যিক্র করেন ও তাঁকে স্মরণে রাখেন এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি ও তার রহস্য ও যুক্তিসমূহ সম্পর্কে

خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١)

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (١٩٢)

(১৯২) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে দোযখে প্রবেশ করাবে, তাকে নিশ্চয় লাঞ্ছিত করবে। আর অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ (١٩٣)

(১৯৩) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যসমূহ গোপন কর এবং মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে মিলিত কর।

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (١٩٤)

(১৯৪) হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা আমাদেরকে দান কর। আর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (١٩٥)

(১৯৫) অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া[১২৩] দিলেন (এবং বললেন), আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না;[১২৪] তোমরা পরস্পর সমশ্রেণীভুক্ত।[১২৫] সুতরাং যারা হিজরত (ধর্মের জন্য স্বদেশত্যাগ) করেছে, নিজ নিজ গৃহ থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি তাদের মন্দ কাজগুলি অবশ্যই গোপন করব, আর অবশ্যই তাদেরকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাব; যার নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত। এ হল আল্লাহর দেওয়া পুরস্কার, বস্তুতঃ আল্লাহর নিকটই উত্তম পুরস্কার রয়েছে।

لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (١٩٦)

(১৯৬) যারা অবিশ্বাস করে, দেশ-বিদেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে অবশ্যই প্রতারিত না করে।[১২৬]

চিন্তা-গবেষণা করেন, তাঁরা বিশ্বস্রষ্টার মহত্ত্ব ও মহাশক্তি, তাঁর জ্ঞান ও এখতিয়ার এবং তাঁর রহমত ও প্রতিপালকত্ব সম্পর্কে সঠিক পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে আপনা-আপনিই তাঁদের মুখ ফুটে বেড়িয়ে আসে যে, বিশ্বের প্রতিপালক এই বিশাল পৃথিবীকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি; বরং এর উদ্দেশ্য হল বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা। যে বান্দা পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করতে পারবে, সে লাভ করবে চিরস্থায়ী জান্নাতের নিয়ামত। আর যে পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে, তার জন্য হবে জাহান্নামের আযাব। এই জন্যই তাঁরা (জ্ঞানীজন) জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার দুআও ক'রে থাকেন। পরের তিনটি আয়াতে ক্ষমা প্রার্থনা এবং কিয়ামতের দিনের লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার দুআ রয়েছে।

(১২৩) فَاسْتَجَابَ এখানে أَجَابَ অর্থাৎ, তিনি তাদের দুআ কবুল করলেন বা তাদের ডাকে সাড়া দিলেন --এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১২৪) 'নর অথবা নারী' কথাটি এখানে এই জন্য বলা হয়েছে যে, ইসলাম কোন কোন বিষয়ে নর ও নারীর মধ্যে তাদের উভয়ের প্রাকৃতিক গুণাবলীর ভিন্নতার কারণে কিছু পার্থক্য করেছে, যেমন, কর্তৃত্বে ও নেতৃত্বে, জীবিকা উপার্জনের দায়িত্বে এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ ও অর্ধেক মীরাস পাওয়ার ব্যাপারে। তাই এই পার্থক্যগুলো দেখে যেন এই মনে ক'রে না নেওয়া হয় যে, নেক কাজের প্রতিদানেও পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য করা হবে। না, এ রকম হবে না। বরং প্রত্যেক নেকীর যে প্রতিদান একজন পুরুষ পাবে, সেই নেকী যদি কোন মহিলা করে, তাহলে সেও অনুরূপ প্রতিদান পাবে।

(১২৫) এটা جملة معترضة অর্থাৎ, বাক্যের মধ্যে ব্যাকরণগত সম্পর্কহীন একটি প্রবিষ্ট বাক্য। এই বাক্যের উদ্দেশ্য হল পূর্বোক্ত বিষয়কে আরো পরিষ্কার ক'রে বর্ণনা করা। অর্থাৎ, নেকী ও আনুগত্যে তোমরা পুরুষ ও মহিলা সমান। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! মহান আল্লাহ হিজরত করার ব্যাপারে মহিলাদের নাম নেননি। তাঁর এ কথার ভিত্তিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। *(তাফসীরে ত্বাবারী, ইবনে কাসীর ও ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১২৬) এখানে সম্বোধন নবী করীম ﷺ-কে করা হলেও এই সম্বোধনের লক্ষ্য সমস্ত উম্মত। 'দেশ-বিদেশে তাদের অবাধ বিচরণ' বলতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এক নগরী থেকে আর এক নগরীতে বা এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাওয়া-আসা। এই বাণিজ্য সফর পার্থিব ভোগ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য এবং ব্যবসার প্রসারতারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই মহান আল্লাহ বলছেন, এগুলো আসলে কিছু দিনের জন্য ক্ষণস্থায়ী লাভের সামগ্রী। এ ব্যাপারে ঈমানদারদেরকে ধোঁকায় পতিত না হয়ে শেষ পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। আর সেই পরিণাম হল, ঈমান থেকে বঞ্চিত হলে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব। দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٩٧)

(১৯৭) এ সামান্য ভোগ-বিলাস মাত্র,[১২৭] অতঃপর দোযখ তাদের বাসস্থান, আর তা কত নিকৃষ্ট শয়নাগার!

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ (١٩٨)

(১৯৮) কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে আতিথ্য। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা পুণ্যবানদের জন্য উত্তম।[১২৮]

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ للهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩٩)

(১৯৯) নিশ্চয় গ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে যারা আল্লাহতে, তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আল্লাহর নিকট বিনয়াবনত হয়ে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর আয়াতকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে না;[১২৯] এরাই তো সেই সকল লোক যাদের জন্য আল্লাহর নিকট পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا

(২০০) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর।[১৩০] ধৈর্য ধারণে

অধিকারী কাফেররা এই আযাবে পতিত হবে। এই বিষয়টা কুরআনের আরো বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হয়েছে। যেমন, [مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ] "কাফেররাই কেবল আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে। কাজেই নগরীসমূহে তাদের বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে।" *(সূরা মু'মিন ঃ ৪)* [قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ، مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ] "বলে দাও, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা অব্যাহতি পাবে না। পার্থিব জীবনে সামান্যই লাভ, অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" *(সূরা ইউনুস ঃ ৬৯-৭০)* [نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ] "আমি তাদেরকে স্বল্পকালের জন্যে ভোগবিলাস করতে দেব, অতঃপর তাদেরকে বাধ্য করবো গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে।" *(সূরা লুক্বমান ঃ ২৪)*

(১২৭) অর্থাৎ, পার্থিব উপকরণাদি এবং ভোগবিলাসের সামগ্রী বাহ্যদৃষ্টিতে যতই বেশী হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা সামান্যই। কেননা, তার তো শেষ পরিণতি ধ্বংসই। আর এগুলো ধ্বংস হওয়ার পূর্বে স্বয়ং তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে, যারা এগুলো অর্জন করার প্রচেষ্টায় আল্লাহকে ভুলে থাকে এবং সর্বপ্রকার নৈতিকতা ও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে।

(১২৮) ওদের বিপরীত যাঁরা প্রতিপালককে ভয় করে পরহেযগারী এবং আল্লাহভীরুতার জীবন যাপন ক'রে তাঁর সমীপে উপস্থিত হবেন, যদিও দুনিয়াতে তাঁদের কাছে আল্লাহ ভুলানোর মত ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এবং অঢেল রুযী ছিল না, তবুও তাঁরা সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা এবং তার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহর মেহমান হবেন এবং সেখানে এই সৎলোকরা যে প্রতিদান পাবেন, তা দুনিয়াতে কাফেররা ক্ষণস্থায়ীভাবে যা পেয়েছে, তা থেকে বহুগুণে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হবে।

(১২৯) এই আয়াতে আহলে-কিতাবের সেই দলের কথা বলা হয়েছে, যে দল রসূল ﷺ-এর রিসালাতের উপর ঈমান এনে ধন্য হয়েছে। তাঁদের ঈমান এবং ঈমানী গুণাবলীর কথা উল্লেখ ক'রে মহান আল্লাহ তাঁদেরকে এমন সব আহলে-কিতাব থেকে পৃথক ক'রে দিলেন, যাদের কাজই ছিল ইসলাম, ইসলামের পয়গম্বর এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা, আল্লাহর আয়াতের পরিবর্তন ও তার অস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ লাভের জন্য (প্রকৃত) জ্ঞানকে গোপন করা। আল্লাহ তাআলা বললেন, আহলে-কিতাবদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ও মু'মিন, তারা এ রকম নয়, বরং তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং সামান্য মূল্যের বিনিময়ে তারা আল্লাহর আয়াতকে বিক্রিও করে না। এর অর্থ হল, যে সব উলামা ও মাশায়েখ পার্থিব স্বার্থ অর্জনের জন্য আল্লাহর আয়াতের পরিবর্তন ঘটায় অথবা তার অর্থ ও ব্যাখ্যার সাথে বাতিল মিশ্রিত করে, তারা ঈমান ও আল্লাহভীরুতা থেকে বঞ্চিত। হাফেয ইবনে কাসীর লিখেছেন যে, আয়াতে আহলে-কিতাবের যে মু'মিনদের কথা উল্লিখিত হয়েছে, ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে তাঁদের সংখ্যা দশ পর্যন্তও পৌঁছে না, তবে খ্রিষ্টানদের মধ্য হতে বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ ক'রে সত্য দ্বীনের অনুসারী হয়েছেন। *(ইবনে কাসীর)*

(১৩০) 'ধৈর্য ধরো' অর্থাৎ, আনুগত্যের পথে অবিচল থাকা এবং কুপ্রবৃত্তি ও ভোগ-বিলাস বর্জন করার ব্যাপারে স্বীয় আত্মাকে কাবু ও আয়ত্তাধীন রাখ। (صَابِرُوا) مُصَابَرَةٌ এর অর্থ হল, যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে শত্রুর মোকাবেলায় অনড় থাকা। এটা হল ধৈর্যের কঠিনতম অবস্থা। এই জন্যই এটাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। رَابِطُوا এর অর্থ হল, যুদ্ধের ময়দানে অথবা প্রতিপক্ষের সামনে সংঘবদ্ধভাবে সব সময় সতর্ক ও জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকা। এটাও উচ্চ সাহসিকতা ও বড়ই উদ্দীপনার কাজ। এই কারণেই হাদীসে এর ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে এসেছে, ((رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا)) "আল্লাহর পথে কোন এক দিন প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।" *(বুখারী)* এ ছাড়াও হাদীসে কষ্টের সময়ে সুন্দরভাবে ওযু করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদক্ষেপ করা এবং এক নামাযের পরে অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করাকেও 'রিবাত্ব' (জিহাদে প্রতিরক্ষার কাজের ন্যায়) বলা হয়েছে। *(সহীহ মুসলিম)*

اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢٠٠)

প্রতিযোগিতা কর এবং (শত্রুর বিপক্ষে) সদা প্রস্তুত থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

সূরা নিসা[১৩১]

(মদীনায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৪, আয়াত সংখ্যা ঃ ১৭৬

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (١)

(১) হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন[১৩২] ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর।[১৩৩] নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً(٢)

(২) আর পিতৃহীনদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ কর এবং উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্ট বদল করো না, এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিশ্রিত ক'রে গ্রাস করো না; নিশ্চয় তা মহাপাপ।[১৩৪]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ

(৩) আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিবাহ কর) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা

([১৩১]) 'নিসা'র অর্থ মহিলাগণ। এই সূরায় মহিলাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ হয়েছে। আর এরই কারণে এই সূরাকে 'সূরা নিসা' বলা হয়েছে।

([১৩২]) 'একটি প্রাণ' বলতে মানবকুলের পিতা আদম ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। আর خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا এতে مِنْهَا থেকে উক্ত প্রাণ অর্থাৎ, আদম ﷺ-কেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আদম ﷺ থেকেই তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। আদম ﷺ থেকে হাওয়াকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত যে, হাওয়া পুরুষ অর্থাৎ, আদম ﷺ থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর পাঁজরের হাড় থেকে। অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, "নারীদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তুমি তার দ্বারা উপকৃত হতে চাও, তবে তার মধ্যে বক্রতা অবশিষ্ট থাকা অবস্থাতেই উপকৃত হতে পারবে।" *(বুখারী ৩৩৩১, মুসলিম ১৪৬৮-নং)* উলামাদের কেউ কেউ এই হাদীসের ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত উক্তিকেই সমর্থন করেছেন। কুরআনের শব্দ خَلَقَ مِنْهَا থেকেও এই মতের সমর্থন হয়। অর্থাৎ, মা হাওয়ার সৃষ্টি সেই একটি প্রাণ থেকেই হয়েছে, যাকে 'আদম' বলা হয়।

([১৩৩]) وَالأَرْحَامَ এর সংযোগ اللَّهَ এর সাথে। অর্থাৎ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকেও ভয় কর। أَرْحَامٌ হলো, رِحِمٌ এর বহুবচন। যার অর্থ হল গর্ভাশয়, যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক মাতৃগর্ভের ভিত্তিতেই কায়েম হয়। এতে মাহরাম (যার সাথে চিরতরের জন্য বিবাহ হারাম, অগম্য বা এগানা) এবং গায়র মাহরাম (গম্য বা বেগানা) সকল আত্মীয়ই শামিল। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অতি বড় গোনাহ। হাদীসসমূহে সর্বাবস্থায় আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম রাখার এবং তাদের অধিকার আদায় করার প্রতি বড়ই তাকীদ করা হয়েছে এবং এ কাজের অনেক ফযীলতের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

([১৩৪]) পিতৃহীন, অনাথ বা ইয়াতীম যখন সাবালক হয়ে যাবে এবং ভাল-মন্দ বুঝতে শিখবে, তখন তাকে তার ধন-সম্পদ বুঝিয়ে (ফিরিয়ে) দাও। 'খাবীস' বলতে নিকৃষ্ট জিনিস এবং 'ত্বাইয়্যিব' বলতে উৎকৃষ্ট জিনিসকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এমন করো না যে, তাদের মাল থেকে উৎকৃষ্ট জিনিসগুলো নিয়ে তার পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস দিয়ে গুনতি পূরণ ক'রে দেবে। এই নিকৃষ্ট জিনিসগুলোকে খাবীস (নাপাক) এবং উৎকৃষ্ট জিনিসগুলোকে ত্বাইয়্যিব (পবিত্র) আখ্যা দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এইভাবে পরিবর্তন করা মাল যদিও প্রকৃতপক্ষে ত্বাইয়্যিব (পবিত্র ও হালাল), তবুও তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা তাকে অপবিত্র করে দিয়েছে। কাজেই এখন তা আর পবিত্র নেই, বরং তোমাদের জন্য তা অপবিত্র ও হারাম হয়ে গেছে। অনুরূপ বেঈমানী ক'রে তাদের মালকে নিজের মালের সাথে মিশ্রিত ক'রে খাওয়াও নিষেধ। তবে যদি তাদের কল্যাণ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাদের মালকে নিজের মালের সাথে মিশ্রিত করা জায়েয।

যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে (স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর)।[১৩৫] এটাই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী।[১৩৬]

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا (٣)

(৪) তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট মনে দিয়ে দাও, পরে তারা খুশী মনে ওর (মোহরের) কিয়দংশ ছেড়ে দিলে, তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর।

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (٤)

(৫) আর আল্লাহ তোমাদের সম্পদকে-- যা তোমাদের উপজীবিকা (জীবনযাত্রার অবলম্বন) করেছেন --তা নির্বোধদের (হাতে) অর্পণ করো না। তা হতে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কর এবং তাদের সাথে মিষ্ট কথা বল।

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً(٥)

(৬) পিতৃহীনদেরকে পরীক্ষা করতে থাকো, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে, তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় ক'রে ও তাড়াতাড়ি ক'রে তা খেয়ে ফেল না। যে অভাবমুক্ত, সে যেন যা অবৈধ তা থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন, সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। আর তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে, তখন তাদের উপর সাক্ষী রেখো। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।[১৩৭]

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً (٦)

(৭) মাতা-পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

([১৩৫]) এই আয়াতের তাফসীর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বিত্তশালিনী এবং রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী ইয়াতীম কন্যা কোন তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে থাকলে, সে তার মাল ও সৌন্দর্য দেখে তাকে বিবাহ ক'রে নিত, কিন্তু তাকে অন্য নারীদের ন্যায় সম্পূর্ণ মোহর দিত না। মহান আল্লাহ এ রকম অবিচার করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা ঘরের ইয়াতীম মেয়েদের সাথে সুবিচার করতে না পার, তাহলে তাদেরকে বিবাহই করবে না। অন্য মেয়েদেরকে বিবাহ করার পথ তোমাদের জন্য খোলা আছে। *(বুখারী ২৪৯৪নং)* এমন কি একের পরিবর্তে দু'জন, তিনজন এবং চারজন পর্যন্ত মেয়েকে তোমরা বিবাহ করতে পার। তবে শর্ত হল, তাদের মধ্যে সুবিচারের দাবী যেন পূরণ করতে পার। সুবিচার করতে না পারলে, একজনকেই বিয়ে কর অথবা অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসী নিয়েই তুষ্ট থাক। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, একজন মুসলিম পুরুষ (সে প্রয়োজন বোধ করলে) একই সময়ে চারজন মহিলাকে বিবাহ ক'রে নিজের কাছে রাখতে পারে; এর বেশী রাখতে পারে না। অনেক সহীহ হাদীসেও এ বিষয়কে আরো পরিষ্কার ক'রে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে এবং চার সংখ্যা পর্যন্ত তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর নবী করীম ﷺ যে চারের অধিক নারীকে বিবাহ করেছিলেন, সেটা ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উম্মতের কারো জন্য তার উপর আমল করা জায়েয নয়। *(ইবনে কাসীর)*

([১৩৬]) অর্থাৎ, একজন মহিলাকেই বিবাহ করা যথেষ্ট হতে পারে। কেননা, একাধিক স্ত্রী রাখলে সুবিচারের যত্ন নেওয়া বড়ই কষ্টকর হয়। যার প্রতি আন্তরিক টান থাকবে, তার জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থাপনার প্রতিই বেশী খেয়াল থাকবে। এইভাবে সে স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার বজায় রাখতে অক্ষম হবে এবং আল্লাহর কাছে অপরাধী গণ্য হবে। কুরআন এই বাস্তব সত্যকে অন্যত্র অতি সুন্দররূপে এইভাবে বর্ণনা করেছে, [وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ] অর্থাৎ "তোমরা যতই সাগ্রহে চেষ্টা কর না কেন, স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা কখনই বজায় রাখতে পারবে না। তবে তোমরা কোন এক জনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং অপরকে ঝোলানো অবস্থায় ছেড়ে দিও না।" *(সূরা নিসা ঃ ১২৯)* এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একাধিক বিবাহ ক'রে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা বজায় না রাখা বড়ই অনুচিত ও বিপজ্জনক ব্যাপার। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির দু'টি স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তন্মধ্যে একটির দিকে ঝুঁকে যায়, এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার অর্ধদেহ ধসা অবস্থায় উপস্থিত হবে।" *(আহমাদ ২/৩৪৭, আসহাবে সুনান, হাকেম ২/ ১৮৬, ইবনে হিব্বান ৪১৯৪নং)*

([১৩৭]) ইয়াতীমদের মালের ব্যাপারে অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশাদি দেওয়ার পর এ কথা বলার অর্থ হল, যতদিন পর্যন্ত ইয়াতীমের মাল তোমার কাছে ছিল, তার তুমি কিভাবে হিফাযত করেছ এবং যখন তার মাল তাকে বুঝিয়ে দিয়েছ, তখন তার মালে কোন কম-বেশী বা কোন প্রকার হেরফের করেছ কি না? সাধারণ মানুষ তোমার বিশুদ্ধতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে জানতে না পারলেও মহান আল্লাহর নিকট তো কিছু গোপন নেই। যখন তোমরা তাঁর কাছে যাবে, তখন তিনি অবশ্যই তোমাদের হিসাব নিবেন। এই জন্যই হাদীসে এসেছে যে, এটা বড়ই দায়িত্বের কাজ। নবী করীম ﷺ আবূ যার ﷺ-কে বললেন, "হে আবূ যার! আমি দেখছি তুমি বড়ই দুর্বল। আর আমি তোমার জন্য তা-ই পছন্দ করি, যা নিজের জন্য করি। কোন দু'জন মানুষের তুমি আমীর হয়ো না এবং ইয়াতীমের মালের দায়িত্ব গ্রহণ করো না।" *(মুসলিম ১৮২৬নং)*

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (٧)

পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে; তা অল্পই হোক অথবা বেশীই হোক, (প্রত্যেকের জন্য) নির্ধারিত অংশ (রয়েছে)।[১৩৮]

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (٨)

(৮) আর সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে, তাদেরকে তা হতে কিছু দান কর এবং তাদের সাথে সদালাপ কর।[১৩৯]

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (٩)

(৯) আর (পিতৃহীনদের সম্পর্কে) মানুষের ভয় করা উচিত, যদি তারা পিছনে অসহায় সন্তান ছেড়ে যেত, (তাহলে) তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। অতএব লোকের উচিত, (এতীম-অনাথ সম্পর্কে) আল্লাহকে ভয় করা এবং ন্যায়-সঙ্গত কথা বলা।[১৪০]

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (١٠)

(১০) নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। আর অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ

(১১) আল্লাহ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন; এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান,[১৪১] কিন্তু দু-এর অধিক কন্যা থাকলে, তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ,[১৪২] আর মাত্র একটি কন্যা থাকলে, তার জন্য অর্ধাংশ।

([১৩৮]) ইসলাম আসার পূর্বে একটি যুলুম এও ছিল যে, মহিলা ও ছোট শিশুদেরকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হত। বড় ছেলে যে যুদ্ধের উপযুক্ত হত, কেবল সেই সমস্ত মালের অধিকারী হত। এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলে দিলেন যে, পুরুষদের মত মহিলা ও ছোট ছেলে-মেয়েরাও তাদের পিতা-মাতার এবং আত্মীয়দের মালের অংশীদার হবে; তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে এটা পৃথক ব্যাপার যে, মেয়ের অংশ ছেলের অর্ধেক। (যেমন, তিনটি আয়াতের পর উল্লেখ করা হয়েছে।) এতে না মহিলার উপর যুলুম করা হয়েছে, আর না তার মর্যাদা খাটো করা হয়েছে, বরং ইসলামের এই উত্তরাধিকার নিয়ম ন্যায় ও সুবিচারের দাবীসমূহের সাথে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, মহিলাদেরকে ইসলাম জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে এবং পুরুষদের উপরেই চাপিয়েছে এই দায়িত্ব। এ ছাড়াও মোহর বাবদ কিছু মাল মহিলার কাছে আসে। একজন পুরুষই এই মাল তাকে দেয়। এই দিক দিয়ে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের উপর অনেক বেশী আর্থিক দায়িত্ব আরোপিত হয়। সুতরাং মহিলার অংশ যদি অর্ধেকের পরিবর্তে পুরুষের সমান হত, তাহলে পুরুষের উপর যুলুম করা হত। বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ তাআলা কারো উপর যুলুম করেননি। কেননা, তিনি সুবিচারক এবং সুকৌশলী।

([১৩৯]) এ নির্দেশকে উলামাদের কেউ কেউ মীরাসের আয়াত দ্বারা রহিত বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু সঠিক হল তা রহিত নয়। বরং এতে রয়েছে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক নৈতিক কর্তব্যের উপর তাকীদ। আর তা হল, সাহায্যের অধিকারী আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা মীরাসের অংশীদার নয়, তাদেরকেও বন্টনের সময় কিছু দিয়ে দিও। আর তাদের সাথে কথা বল স্নেহ ও ভালবাসাজড়িত কণ্ঠে। ধন-সম্পদ আসতে দেখে ক্বারুন ও ফিরাউন হয়ে যেও না।

([১৪০]) কোন কোন মুফাস্সিরের নিকট এই আয়াতে 'অসী'দেরকে (যাদেরকে অসিয়ত করা হয় তাদেরকে) সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে নসীহত করা হচ্ছে যে, তাদের তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতীমরা রয়েছে, তাদের সাথে যেন তারা ঐরূপ সুন্দর ব্যবহার করে, যেরূপ সে পছন্দ করে তার মৃত্যুর পর তার সন্তানদের সাথে করা হোক। আবার কোন কোন মুফাস্সের বলেছেন, এতে সাধারণ লোকদের সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে যে, তারা যেন ইয়াতীম এবং অন্য ছোট ছোট শিশুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে; চাহে তারা তার তত্ত্বাবধানে হোক বা না হোক। কেউ বলেছেন, এখানে সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যে মৃত্যুর নিকটবর্তী ব্যক্তির পাশে বসে আছে। তার দায়িত্ব হল মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে উত্তম কথা শিক্ষা দেওয়া, যাতে সে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের অধিকারের ব্যাপারে যেন কোন অবহেলা না করে এবং অসিয়ত করার সময় যেন এই উভয় অধিকারের খেয়াল রাখে। সে যদি বড় বিত্তশালী হয়, তাহলে তার অভাবী ও সাহায্যের প্রত্যাশী নিকটাত্মীয়ের জন্য নিজের মালের এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত যেন অবশ্যই করে অথবা কোন দ্বীনী কাজে বা দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করার জন্য যেন অসিয়ত করে। কারণ, এই মালই হবে তার আখেরাতের সম্বল। আর সে যদি বিত্তশালী না হয়, তাহলে তার মালের এক তৃতীয়াংশেও অসিয়ত করতে তাকে বাধা দিতে হবে। যাতে তার পরিবারের লোকরা যেন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। অনুরূপ কেউ যদি তার কোন উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করতে চায়, তাহলে তাকে এ কাজে বাধা দিতে হবে এবং তার উত্তরাধিকারীদের জন্য সেটাই করা পছন্দ করবে, যা করা সে পছন্দ করে নিজের সন্তানাদির উপর অভাব-অনটনের আশঙ্কা বোধ করলে। এই ব্যাখ্যায় উল্লিখিত সকলেই আয়াতের সম্বোধনের আওতায় এসে যায়। *(তাফসীর কুরতুবী-ফাতহুল ক্বাদীর)*

([১৪১]) এর যৌক্তিকতা এবং এটা যে সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কথা পূর্বে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ছেলে-মেয়ে উভয়ই হলে এই নীতি অনুযায়ী বন্টন হবে। ছেলে ছোট হোক বা বড়, অনুরূপ মেয়ে ছোট হোক বা বড় সকলেই উত্তরাধিকারী হবে। এমন কি গর্ভস্থ সন্তানও উত্তরাধিকারী হবে। তবে কাফের সন্তানরা ওয়ারিস হবে না।

([১৪২]) অর্থাৎ, কোন ছেলে যদি না থাকে, তাহলে মালের দুই তৃতীয়াংশ (মালকে তিনভাগ ক'রে দু'ভাগ) দু'য়ের অধিক

وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (١١)

তার সন্তান থাকলে, তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ,[১৪৩] সে নিঃসন্তান হলে এবং কেবল পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে, তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ,[১৪৪] তার ভাই-বোন থাকলে, মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ।[১৪৫] এ (সবই) সে যা অসিয়ত (মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি উইল) করে, তা কার্যকর ও তার (ছেড়ে যাওয়া) ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমরা তো জান না, তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী।[১৪৬] এ আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত বিধান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ

(১২) তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, কিন্তু তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ।[১৪৭] এ তারা যা অসিয়ৎ করে তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। আর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তাদের জন্য, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ।[১৪৮] এ তোমরা

মেয়েদেরকে দেওয়া হবে। আর যদি মেয়ে কেবল দু'জনই হয়, তবুও তারা তিনভাগের দু'ভাগই পাবে। কারণ, হাদীসে এসেছে যে, সা'দ ইবনে রাবী' ﷺ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। তাঁর ছিল দু'টি মেয়ে। সা'দ ﷺ-এর এক ভাই তাঁর সমস্ত মাল জবরদখল ক'রে নেয়। কিন্তু নবী করীম ﷺ মালের দুই তৃতীয়াংশ মেয়েদের চাচার কাছ থেকে নিয়ে তাদেরকে দিয়ে দেন। *(তিরমিযী ২০৯২, আবূ দাউদ ২৮৯১, ইবনে মাজাহ ২৭২০নং)* এ ছাড়া সূরা নিসার শেষে বলা হয়েছে যে, কোন মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী যদি কেবল তার দু'জন বোন হয়, তবে তারাও মালের দুই তৃতীয়াংশ পাবে। কাজেই দু'বোনে যদি মালের দুই তৃতীয়াংশের ওয়ারিস হয়, তাহলে দু'জন মেয়ের মালের দুই তৃতীয়াংশের মালিক হওয়ার অধিকার আরো বেশী। অনুরূপ দু'য়ের অধিক বোনের বিধান হল দু'য়ের অধিক মেয়ের মতনই। (অর্থাৎ, বোন দু'জন হোক বা দু'য়ের অধিক তারা মালের দুই তৃতীয়াংশই পাবে।) *(ফাতহুল ক্বাদীর)* সার কথা হল, দু'জন বা দু'য়ের অধিক মেয়ে হলে, মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি থেকে দুই তৃতীয়াংশই পাবে। অবশিষ্ট মাল 'আসাবাহ' (সবচেয়ে নিকটাত্মীয় উত্তরাধিকারী) জাতীয় ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন হবে।

(১৪৩) পিতা-মাতার অংশের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অবস্থা হল, মৃত ব্যক্তির যদি সন্তানাদি থাকে, তাহলে তার (মৃত ব্যক্তির) পিতা ও মাতা উভয়েই মালের এক ষষ্ঠাংশ (ছয় ভাগের এক ভাগ) ক'রে পাবে। অবশিষ্ট মাল সন্তানদের মধ্যে বন্টন হবে। তবে মৃত ব্যক্তির সন্তান বলতে যদি কেবল একটি মেয়ে হয়, তাহলে মালের অর্ধেক (অর্থাৎ, ছয় ভাগের তিন ভাগ) মেয়ে পাবে, এক ষষ্ঠাংশ মা পাবে এবং আর এক ষষ্ঠাংশ বাপ পাবে। অতঃপর আরো যে এক ষষ্ঠাংশ অবশিষ্ট থাকবে, সেটাও 'আসাবাহ' হিসেবে পিতার ভাগে যাবে। অর্থাৎ, পিতা পাচ্ছে দুই ষষ্ঠাংশ। এক ষষ্ঠাংশ পিতা হিসেবে এবং আর এক ষষ্ঠাংশ 'আসাবাহ' হিসেবে।

(১৪৪) এটা হল, দ্বিতীয় অবস্থা। মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি নেই (জ্ঞাতব্য যে, পোতা-পুতীরাও সকলের ঐকমত্যে সন্তানাদির মধ্যেই শামিল) এই অবস্থায় মা পাবে এক তৃতীয়াংশ। অবশিষ্ট দু'ভাগ 'আসাবাহ' হিসেবে বাপ পাবে। আর যদি পিতা-মাতার সাথে মৃত পুরুষের স্ত্রী বা মৃত মহিলার স্বামীও জীবিত থাকে, তবে প্রাধান্য প্রাপ্ত উক্তি অনুযায়ী স্ত্রী বা স্বামীর অংশ (পরে এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে) বের করে নেওয়ার পর অবশিষ্ট মাল থেকে মায়ের হবে এক তৃতীয়াংশ এবং বাকী যা থাকে তা হবে বাপের।

(১৪৫) তৃতীয় অবস্থা হল, পিতা-মাতার সাথে মৃত ব্যক্তির ভাই-বোনও জীবিত আছে। তাতে তারা সহোদর অর্থাৎ, এক মাতৃগর্ভজাত হোক অথবা বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই-বোন হোক। যদিও এই ভাই-বোন মৃত ব্যক্তির পিতার উপস্থিতিতে উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার রাখে না, তবুও তারা মায়ের জন্য 'হাজবু নুক্বসান' (তার অংশ হ্রাস করণের) কারণ হবে। অর্থাৎ, তারা একাধিক হলে মায়ের এক তৃতীয়াংশকে এক ষষ্ঠাংশে পরিবর্তন ক'রে দেবে। অবশিষ্ট সমস্ত মাল (ছ'ভাগের পাঁচভাগ) পিতার অংশে চলে যাবে। তবে শর্ত হল আর কোন ওয়ারিস যেন না থাকে। হাফেয ইবনে কাসীর লিখেছেন যে, দুইজন ভায়ের বিধানও দু'য়ের অধিক ভায়ের বিধানের মতনই। অর্থাৎ, ভাই বা বোন যদি কেবল একজন হয়, তাহলে মায়ের এক তৃতীয়াংশ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাতে কোন পরিবর্তন সূচিত হবে না।

(১৪৬) অতএব তোমরা তোমাদের জ্ঞানানুযায়ী মীরাস বন্টন করো না, বরং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তা বন্টন কর এবং যার যতটা অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাকে তা প্রদান কর।

(১৪৭) সন্তানাদি না থাকা অবস্থায় পুত্রের সন্তানরা অর্থাৎ, পোতারা সন্তানের বিধানভুক্ত হবে। এ ব্যাপারে উলামাগণ ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর ও ইবনে কাসীর)* মৃত স্বামীর সন্তানাদির বিধানও অনুরূপ, তাতে তারা উত্তরাধিকারিণী এই স্ত্রীর গর্ভজাত হোক অথবা তার অপর কোন স্ত্রীর গর্ভজাত হোক। মৃতা স্ত্রীর সন্তানাদির ব্যাপারটাও অনুরূপ, তাতে তারা এই স্ত্রীর উত্তরাধিকারী স্বামীর হোক অথবা স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর হোক।

(১৪৮) স্ত্রী একজন হলে সে এক চতুর্থাংশ অথবা এক অষ্টমাংশ পাবে। অনুরূপ একাধিক স্ত্রী হলেও এই অংশই (এক চতুর্থাংশ বা

بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ

যা অসিয়ৎ কর তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতা-মাতা ও সন্তানহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে[১৪৯] এবং তার এক (বৈপিত্রেয়) ভাই ও বোন থাকে,[১৫০] তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে।[১৫১] এ যা অসিয়ৎ করা হয় তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর[১৫২] এবং এ যেন কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়।[১৫৩] এ হল আল্লাহর নির্দেশ। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল।

(১৩) এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হয়ে চলবে আল্লাহ তাকে বেহেশ্তে স্থান দান করবেন; যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ মহা সাফল্য।

এক অষ্টমাংশ) তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে। প্রত্যেকে একাকিনী এক চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশ পাবে না। এ ব্যাপারেও সকলে একমত। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১৪৯) كَلَالَة এর অর্থ হল, এমন মৃত যার না পিতা আছে, না পুত্র। এটা إِكْلِيل ধাতু থেকে গঠিত। আর তা এমন জিনিস (মুকুট)কে বলা হয় যা মাথাকে তার চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখে। 'কালালা'কে এই জন্যই 'কালালা' বলা হয় যে, মূল বা শাখা হিসাবে তো তার কেউ ওয়ারিস হয় না, কিন্তু ধার-পাশ দিয়ে ওয়ারিস গণ্য হয়ে যায়। *(ফাতহুল ক্বাদীর ও ইবনে কাসীর)* বলা হয় যে, 'কালালা' كَلَّ ধাতু থেকে গঠিত। যার অর্থ, ক্লান্ত হয়ে পড়া। অর্থাৎ, বংশ সূত্র মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সামনে আর অগ্রসর হতে পারেনি।

(১৫০) এ থেকে বৈপিত্রেয় (এক মাতার গর্ভে ভিন্ন পিতার ঔরসজাত) ভাই-বোনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের অংশ এই রকম নয়। এদের বর্ণনা সূরার শেষে আসবে। আর এ মতও সর্বসম্মত মত। আসলে জন্মসূত্র সম্পর্কিত নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে [لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (একটি পুরুষের ভাগ দুটি মহিলার সমান) নিয়ম চলে। এই কারণেই বেটা-বেটীদের জন্য এখানে এবং ভাই-বোনদের জন্য সূরা নিসার শেষের আয়াতে এই নিয়মের কথাই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু মায়ের সন্তানদের (বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের) যেহেতু জন্মসূত্রের নিয়মে অংশ ভাগ হয় না, তাই তাদের (নারী-পুরুষ) সকলকে সমান সমান অংশ দেওয়া হয়। কথা হল, কেবল একজন ভাই অথবা একজন বোন হলে, প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ পাবে।

(১৫১) আর একাধিক হলে সকলে এক তৃতীয়াংশে শরীক হবে। অনুরূপ এদের মধ্যে নারী-পুরুষেরও কোন পার্থক্য হবে না। নারী-পুরুষ সকলে সমান সমান অংশ পাবে।

বিঃ দ্রষ্টব্যঃ বৈপিত্রেয় ভাই-বোন কোন কোন বিধানে অন্যান্য ওয়ারিসদের থেকে ভিন্ন। যেমন ঃ (ক) এরা কেবল তাদের মায়ের কারণে ওয়ারিস হবে। (খ) এদের নারী-পুরুষের অংশ সমান সমান হবে। (গ) এরা তখনই ওয়ারিস হবে, যখন মৃত 'কালালা' (মূল ও শাখাবিহীন) হবে। অতএব পিতা, পিতামহ, পুত্র এবং পৌত্রের উপস্থিতিতে এরা ওয়ারিস হবে না। (ঘ) তারা নারী-পুরুষ যত জনই হোক না কেন, তাদের অংশ এক তৃতীয়াংশের বেশী হবে না এবং যেমন পূর্বে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের মৃত বৈপিত্রেয় ভাই থেকে যে মাল পাবে তাতে নারী ও পুরুষের অংশ সমান সমান হবে; পুরুষরা নারীদের দ্বিগুণ পাবে না। উমার ﷺ তাঁর রাজত্বকালে এই ফায়সালাই করেছিলেন। ইমাম যুহরী বলেন, উমার ﷺ যখন এ ফায়সালা করেছেন, তখন অবশ্যই তাঁর কাছে এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ এর কোন হাদীস ছিল। *(ইবনে কাসীর)*

(১৫২) মীরাসের বিধান বর্ণনা করার সাথে সাথে এখানে তৃতীয়বার বলা হচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তির ভাগাভাগি তার অসিয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধ করার পর হবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই দু'টি বিষয়ের উপর আমল করা অতীব জরুরী। অতঃপর এ ব্যাপারেও সকলে একমত যে, প্রথমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে, তারপর অসিয়ত কার্যকরী হবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তিন স্থানেই অসিয়তের উল্লেখ ঋণের পূর্বে করেছেন। অথচ ক্রমানুযায়ী ঋণের উল্লেখ প্রথমে হওয়া উচিত ছিল। এর কারণ হল, ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব তো মানুষ দেয়, না দিলেও প্রাপক জোর ক'রে তা আদায় ক'রে নেয়। কিন্তু অসিয়তের উপর আমল করা জরুরী মনে করা হয় না। অধিকাংশ লোক এ ব্যাপারে ঢিলামি ও গড়িমসি করে। এই কারণেই অসিয়তের কথা আগে উল্লেখ ক'রে তার গুরুত্বের কথা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। *(রূহুল মাআ'নী)*

বিঃ দ্রষ্টব্য ঃ যদি স্ত্রীর দেনমোহর আদায় করা না হয়, তাহলে সেটাও ঋণ বলে গণ্য এবং ত্যক্ত সম্পত্তির ভাগাভাগির পূর্বে তা আদায় করা জরুরী হবে। আর তার (স্ত্রীর) নির্দিষ্ট অংশ হবে এ থেকে পৃথক।

(১৫৩) এটা এইভাবে যে, অসিয়তের মাধ্যমে কোন ওয়ারিসকে বঞ্চিত করা হবে অথবা কারো অংশে কমবেশী করা হবে কিংবা কেবল ওয়ারিসদের ক্ষতি করার জন্য বলে দেবে যে, অমুকের কাছ থেকে এতটা ঋণ নিয়েছি, অথচ সে কিছুই নেয়নি। অর্থাৎ, ক্ষতির সম্পর্ক অসিয়ত ও ঋণ উভয়েরই সাথে এবং এই উভয় পন্থায় ক্ষতিগ্রস্ত করা নিষেধ ও তা মহাপাপ। পরন্তু এ রকম অসিয়তও বাতিল গণ্য হবে।

الْعَظِيمُ (١٣)

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

(১৪) পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি।

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً(١٥)

(১৫) তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চার জন (পুরুষ) সাক্ষী উপস্থিত কর। সুতরাং যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদেরকে গৃহবন্দী করে রাখ, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয়[১৫৪] অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন।[১৫৫]

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً (١٦)

(১৬) আর তোমাদের মধ্যে যে দু'জন এতে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হবে[১৫৬] তাদের উভয়কে শাস্তি দাও।[১৫৭] তবে যদি তারা তওবা করে এবং সংশোধন ক'রে নেয়, তাহলে তাদেরকে রেহাই দাও। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (١٧)

(১৭) আল্লাহ অবশ্যই সেই সব লোকের তওবা গ্রহণ করবেন, যারা অজ্ঞাতসারে মন্দ কাজ ক'রে বসে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা ক'রে নেয়; এরাই তো তারা, যাদের তওবা আল্লাহ গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً(١٨)

(১৮) এবং (আজীবন) যারা মন্দ কাজ করে, তাদের জন্য তওবা নয়, আর তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তওবা করছি।'[১৫৮] আর যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা যায়, তাদের জন্যও তওবা নয়। এরাই তো তারা, যাদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً

(১৯) হে বিশ্বাসিগণ! জোরজবরদস্তি ক'রে তোমাদের নিজেদেরকে নারীদের উত্তরাধিকারী গণ্য করা বৈধ নয়।[১৫৯]

([১৫৪]) এটা হল ব্যভিচারী নারীর এমন শাস্তি যা ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন ব্যভিচারের কোন শাস্তি নির্দিষ্ট ছিল না, তখন সাময়িকভাবে এই শাস্তি কার্যকরী ছিল। এখানে একটি কথা স্মরণে রাখা দরকার যে, আরবী ভাষায় এক থেকে দশ পর্যন্ত গণনায় একটি শিরোধার্য (ব্যাকরণের) নীতি হল, عدد বা সংখ্যা যদি পুংলিঙ্গ হয়, তাহলে তার معـدود বা গণিত বিষয়ক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হবে। আর যদি সংখ্যা স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তাহলে গণিত বিষয়ক শব্দ পুংলিঙ্গ হবে। এখানে (আয়াতে) أَرْبَعَـةٌ (অর্থাৎ, চার সংখ্যা) স্ত্রীলিঙ্গ সুতরাং তার গণিত বিষয়ক শব্দ যা এখানে উল্লিখিত হয়নি, উহ্য আছে, অবশ্যই তা পুংলিঙ্গ হবে। ফলে অর্থ দাঁড়াবে চারজন পুরুষ। আর এ থেকে এ কথা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, ব্যভিচারের প্রমাণের জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষী অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ, যেমন ব্যভিচারের শাস্তি অতি কঠিন, তেমনি তার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী হওয়ার কড়া শর্ত লাগানো হয়েছে। চারজন মুসলিম পুরুষকে স্বচক্ষে (ব্যভিচার সম্পাদন) দেখতে হবে। তাছাড়া তার শরীয়ত-নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা সম্ভব হবে না।

([১৫৫]) এখানে পথ বা ব্যবস্থা বলতে ব্যভিচারের শাস্তি বুঝানো হয়েছে যা পরে নির্দিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ, বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর জন্য হল 'রজম' (পাথরের আঘাতে হত্যা) এবং অবিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি হল, একশ' বেত্রাঘাত। (এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা নূরে এবং বহু সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।)

([১৫৬]) কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন সমলিঙ্গী ব্যভিচার; যাতে দু'জন পুরুষ আপোসে এ কুকাজ সম্পাদন ক'রে থাকে। আবার কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা। আর পূর্বের আয়াতকে তাঁরা বিবাহিত পুরুষ ও মহিলার সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। আবার কেউ কেউ এই দ্বিবচন শব্দের অর্থ করেছেন, পুরুষ ও মহিলা। তাতে তারা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত। ইবনে জারীর ত্বাবারী দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ, অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং পূর্বের আয়াতে বর্ণিত শাস্তিকে নবী করীম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত শাস্তি দ্বারা ও এই আয়াতে বর্ণিত শাস্তিকে সূরা নূরে বর্ণিত একশ' বেত্রাঘাত শাস্তি দ্বারা রহিত সাব্যস্ত করেছেন। *(তাফসীর ত্বাবারী)*

([১৫৭]) অর্থাৎ, মৌখিক ধমক ও তিরস্কারের মাধ্যমে অথবা হাত দ্বারা স্বল্প মার-ধর করে। তবে এখন এটা রহিত; যেমন পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

([১৫৮]) এ থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মৃত্যুর সময় কৃত তওবা গৃহীত হয় না। অনুরূপ কথা হাদীসেও এসেছে। আর এর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সূরা আল-ইমরানের ৯০নং আয়াতে অতিবাহিত হয়েছে।

([১৫৯]) ইসলাম আসার পূর্বে মহিলার প্রতি এই অবিচারও করা হত যে, স্বামী মারা গেলে তার (স্বামীর) পরিবারের লোকেরা

وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (١٩)

তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে[১৬০] তাদেরকে আটক রেখো না; যদি না তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা (ব্যভিচার বা স্বামীর অবাধ্যাচরণ) করে।[১৬১] আর তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর; তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ।[১৬২]

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (٢٠)

(২০) আর যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না,[১৬৩] তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে?

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً (٢١)

(২১) কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা পরস্পর মিলিত হয়েছ[১৬৪] এবং তারা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?[১৬৫]

وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ

(২২) নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষ বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না,[১৬৬] অবশ্য যা অতীতে

সম্পদ-সম্পত্তির মত এই মহিলারও জোরপূর্বক উত্তরাধিকারী হয়ে বসত এবং নিজ ইচ্ছায় তার সম্মতি ছাড়াই তাকে বিবাহ ক'রে নিত অথবা তাদের কোন ভাই ও ভাইপোর সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিত। এমন কি সৎ বেটাও মৃত পিতার স্ত্রী (সৎ মা)কে বিবাহ করত অথবা ইচ্ছা করলে তাকে অন্য কোথাও বিবাহ করার অনুমতি দিত না এবং সে তার পূর্ণ জীবন বিয়ে ছাড়াই (বিধবা অবস্থায়) অতিবাহিত করতে বাধ্য হত। ইসলাম এই ধরনের সমস্ত প্রকারের যুলুম থেকে নিষেধ করেছে।

(১৬০) আরো একটি যুলুম এই ছিল যে, যদি কোন স্বামীর স্ত্রী পছন্দ না হত এবং সে তার নিকট থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইত, তাহলে (এই রকম পরিস্থিতিতে ইসলাম যেভাবে তালাক্ব দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে সেভাবে) সে তাকে তালাক্ব না দিয়ে তার উপর অযথা সংকীর্ণতা সৃষ্টি করত; যাতে সে (স্ত্রী) বাধ্য হয়ে স্বামী প্রদত্ত দেনমোহর এবং যা কিছু সে দিয়েছে তা স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দিয়ে তার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করাকে প্রাধান্য দেয়। ইসলাম এই আচরণকেও অত্যাচার ও যুলুম বলে গণ্য করেছে।

(১৬১) 'প্রকাশ্য অশ্লীলতা' বলতে ব্যভিচার অথবা গালাগালি ও অবাধ্যতাকে বুঝানো হয়েছে। এই উভয় অবস্থায় স্বামীকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, সে তার সাথে এমন আচরণ করবে যাতে সে তার দেওয়া মাল বা দেনমোহর ফিরিয়ে দিয়ে খুলআ' করতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, স্ত্রী খুলআ' (ত্বালাক্ব) নিলে স্বামীকে দেনমোহর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। *(দ্রষ্টব্যঃ সূরা বাক্বারার ২২৯নং আয়াত)*

(১৬২) এটা স্ত্রীর সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করতে বলার এমন নির্দেশ, যার প্রতি অতি তাকীদ করা হয়েছে এবং হাদীসসমূহেও এই বিষয়টাকে বড়ই গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। একটি হাদীসে আয়াতের এই অর্থটাকে ঠিক এইভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, ((لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)) অর্থাৎ, "কোন মু'মিন পুরুষ যেন কোন মু'মিন নারীকে ঘৃণা না করে। তার কোন একটি অভ্যাস তার কাছে খারাপ লাগলেও অপরটি ভাল লাগবে।" *(মুসলিম ১৪৬৯নং)* অর্থাৎ, অশ্লীলতা ও অবাধ্যতা ব্যতীত অন্য কোন এমন দোষ যদি স্ত্রীর মধ্যে থাকে, যে দোষের কারণে স্বামী তাকে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন তাড়াহুড়া ক'রে তাকে তালাক্ব না দেয়, বরং সে যেন ধৈর্য ও সহ্যের পথ অবলম্বন করে। হতে পারে এতে মহান আল্লাহ তার জন্য অজস্র কল্যাণ দান করবেন। অর্থাৎ, সৎ সন্তানাদি দান করবেন কিংবা তার কারণে আল্লাহ তাআলা তার ব্যবসা বা কাজে বর্কত দান করা সহ আরো অনেক কিছু দেবেন। অনুতাপের বিষয় যে, কুরআন ও হাদীসের এই নির্দেশনার বিপরীত পথ অবলম্বন ক'রে মুসলিমরা আজ সামান্য ও তুচ্ছ কারণের ভিত্তিতে স্ত্রীদেরকে তালাক্ব দিয়ে দেয় এবং এইভাবে তারা ইসলামের দেওয়া তালাক্বের অধিকারকে বড়ই অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। অথচ এই অধিকার দেওয়া হয়েছে কেবল নিরুপায় অবস্থায় ব্যবহার করার জন্য; সংসারের বিনাশ, মহিলাদের উপর যুলুম এবং সন্তানদের জীবন বিনষ্ট করার জন্য নয়। এ ছাড়া এতে ইসলামের বদনামও হয়। বলা হয় যে, ইসলাম পুরুষদেরকে তালাক্বের অধিকার দিয়ে নারীদের উপর যুলুম করার এখতিয়ার দিয়েছে। এইভাবে ইসলামের একটি অতি সুন্দর বৈশিষ্ট্যকে অন্যায় ও যুলুম বিবেচিত করানো হয়।

(১৬৩) স্বামী নিজ ইচ্ছায় তালাক্ব দিলে স্ত্রীর কাছ থেকে মোহর ফেরৎ নিতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। قِنْطَارٌ বলা হয় ধন-ভান্ডার এবং প্রচুর সম্পদকে। অর্থাৎ, মোহর যতটা পরিমাণই হোক না কেন তা ফেরৎ নিতে পারবে না। যদি এ রকম কর, তাহলে তা যুলুম এবং প্রকাশ্য পাপ হবে।

(১৬৪) 'অথচ তোমরা পরস্পর মিলিত হয়েছ' এর অর্থ, সহবাস করা। মহান আল্লাহ এটাকে ইঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন।

(১৬৫) 'দৃঢ় প্রতিশ্রুতি' বলতে সেই প্রতিশ্রুতি যা বিবাহের সময় পুরুষের কাছ থেকে নেওয়া হয়। আর তা হল, 'হয় তোমরা তাদেরকে নিয়ে ভালভাবে জীবন-যাপন করবে, না হয় সদ্ভাবে তাদেরকে বর্জন করবে।'

(১৬৬) ইসলামের পূর্বে জাহেলী যুগে সৎ বেটা নিজের বাপের স্ত্রী (অর্থাৎ, সৎ মা)কে বিবাহ ক'রে নিত। এই কাজ থেকে বাধা

سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً (٢٢)

হয়ে গেছে (তা ধর্তব্য নয়)। নিশ্চয় তা অশ্লীল, ক্রোধজনক ও নিকৃষ্ট আচরণ।

দেওয়া হচ্ছে। কারণ, এটা বড়ই নির্লজ্জতার কাজ। [وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ] আয়াতের সাধারণ অর্থ এমন মহিলার সাথেও বিবাহ নিষেধ ঘোষণা করছে, যাকে তার পিতা বিবাহ করেছে এবং সহবাসের পূর্বেই তালাক্ব দিয়ে দিয়েছে। ইবনে আব্বাস ﷺ থেকেও এই উক্তিই বর্ণিত হয়েছে। উলামাগণের মতও এটাই। *(তাফসীরে ত্বাবারী)*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

(২৩) তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হয়েছে[১৬৭] তোমাদের মাতাগণ, কন্যাগণ, ভগিনীগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ,

([১৬৭]) যে মহিলাদের সাথে বিবাহ হারাম এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে সাত প্রকার নারী বংশীয় সম্পর্কের কারণে হারাম। আর সাত প্রকার নারী দুধ সম্পর্কের কারণে হারাম এবং চার প্রকার নারী বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম। এ ছাড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ফুফু-ভাইঝি অথবা খালা-বুনঝি উভয়কে একত্রে বিবাহ করা হারাম। বংশীয় সম্পর্কের কারণে যারা হারাম তারা হল ঃ মায়েরা, মেয়েরা, বোনেরা, ফুফুরা, খালারা এবং ভাইঝি ও ভাগ্নীরা। আর দুধ সম্পর্কের কারণে যারা হারাম তারা হল, দুধমায়েরা, দুধ মেয়েরা, দুধ বোনেরা, দুধ ফুফুরা, দুধ খালারা এবং দুধ ভাইঝি ও ভাগ্নীরা। বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যারা হারাম তারা হল, শাশুড়ী, সৎ মেয়ে (যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে তার প্রথম স্বামীর মেয়েরা) এবং পুত্রবধু ও দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা। এ ছাড়া পিতার স্ত্রীও হারাম (যার কথা পূর্বে এসেছে)। আর হাদীস অনুযায়ী স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার (স্ত্রীর) ফুফু, খালা এবং তার ভাইঝি ও ভাগ্নীর সাথে বিবাহ হারাম। **মায়েরা** বলতে মায়ের মা (নানী), মায়ের দাদী এবং বাপের মা (দাদী) ও দাদীর মা ও তার দাদী এইভাবে পর্যায়ক্রমে যত আসবে সকলেই মায়ের আওতায় পড়বে। **আর মেয়ের আওতায় পড়বে,** পুতনীরা, নাতনীরা এবং পুতনী ও নাতনীদের মেয়েরা। ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম লাভকারিণী বেটি মেয়ের মধ্যে শামিল হবে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তিন ইমাম তাকে মেয়ের মধ্যেই শামিল করেছেন এবং তার সাথে বিবাহ হারাম মনে করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সে বিধিসম্মত মেয়ে নয়। কাজেই যেভাবে সে [يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ] (মহান আল্লাহ তোমাদেরকে ত্যক্ত সম্পদ সন্তানদের মধ্যে বন্টন করার নির্দেশ দিচ্ছেন।) সন্তানের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সকলের ঐক্যমতে সে ওয়ারিস হয় না, অনুরূপ সে এই আয়াতেও মেয়ের মধ্যে শামিল হবে না। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। *(ইবনে কাসীর)* **বোনের পর্যায়ে পড়বে** সহোদরা বোন, বৈপিত্রেয়ী বোন এবং বৈমাত্রেয়ী বোন সকলেই। **ফুফুর মধ্যে** বাপের, নানার এবং দাদার তিন প্রকার বোনরা শামিল। **খালার** অন্তর্ভুক্ত হল, মায়ের এবং নানী ও দাদীর তিন প্রকারের বোনরা। **ভাইঝি বলতে** তিন প্রকার (সহোদর, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয়) ভাইদের আপন মেয়ে এবং তাদের মেয়েদের মেয়ে সকলেই শামিল। **ভাগ্নীর পর্যায়ে পড়ে** তিন প্রকার বোনদের আপন মেয়ে এবং তাদের মেয়েদের মেয়ে।

দুধ সম্পর্কের কারণে যারা হারাম তারা হল, **দুধ মা,** যার দুধ আপনি দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ, দু'বছরের মধ্যেই) পান করেছেন। **দুধ বোন,** সেই মহিলা যাকে আপনার আপন মা অথবা দুধমা দুধ পান করিয়েছে। আপনার সাথেই পান করিয়ে থাক অথবা আপনার আগেই কিংবা আপনার পরে আপনার অন্য ভাই-বোনদের সাথে পান করিয়ে থাক। অনুরূপ যে মহিলার আপন মা অথবা দুধমা আপনাকে দুধ পান করিয়েছে, যদিও বিভিন্ন সময়ে পান করিয়ে থাকে। দুধ পানের কারণে সেই সমস্ত সম্পর্ক হারাম হয়ে যাবে, যা বংশীয় কারণে হারাম হয়। অর্থাৎ, দুধ মায়ের বংশীয় ও দুধ সম্পর্কের সন্তানরা দুধ পানকারীর ভাই-বোন, এই মায়ের স্বামী তার পিতা, এই পিতার বোনরা তার ফুফু, এই মায়ের বোনরা তার খালা, এবং এই মায়ের স্বামীর ভায়েরা তার চাচা হয়ে যাবে। আর দুধ পানকারী শিশুর বংশীয় ভাই-বোন ইত্যাদি দুধ পানের কারণে এই পরিবারের উপর হারাম হবে না।

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যারা হারাম হয় তারা হল, **স্ত্রীর মা** অর্থাৎ, শাশুড়ী। (স্ত্রীর নানী-দাদীও এর অন্তর্ভুক্ত হবে) যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করার পরে পরেই সহবাস না ক'রেই তালাক্ব দিয়ে দেয়, তবুও তার মায়ের (শাশুড়ীর) সাথে বিবাহ হারাম হবে। তবে যদি কোন মহিলাকে বিয়ের পর সহবাস না ক'রেই তালাক্ব দিয়ে দেয়, তাহলে তার মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয হবে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* رَبِيْبَة **'রাবীবা'** (সৎ বেটী) স্ত্রীর আগের স্বামীর মেয়ে। এটা শর্তের ভিত্তিতে হারাম হয়। যেমন, যদি সৎ বেটীর মায়ের সাথে সহবাস করে নেয় তবেই সে হারাম হবে, অন্যথা তার সাথে বিয়ে হালাল। فِي حُجُوْرِكُمْ (যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে) এটা অধিকাংশ অবস্থার দিকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে, শর্ত হিসাবে বলা হয়নি। অতএব এই মেয়ে যদি কোন অন্য কারো অভিভাবকত্বে বা অন্য স্থানে লালিতা-পালিতা হয় বা অন্য জায়গায় বসবাস ক'রে থাকে, তবুও তার সাথে বিবাহ হারাম। حلائل হল حَلِيْلَةٌ এর বহুবচন। حَلَّ يَحِلُّ (অবতরণ করা) ধাতু থেকে فَعِيْلَةٌ এর ওজনে فَاعِلَةٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্ত্রীকে 'হালীলা' এই জন্য বলা হয়েছে যে, তার (অবতরণের জায়গা) বাসস্থান স্বামীর সাথেই হয়। অর্থাৎ, যেখানে স্বামী অবতরণ করে বা বসবাস করে, সেখানে সেও অবতরণ করে বা বসবাস করে। পোতা ও নাতীরাও পুত্রের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, তাদের স্ত্রীদের সাথেও বিবাহ হারাম। অনুরূপ দুধ সম্পর্কের ছেলেদের স্ত্রীরাও হারাম হবে। مِنْ أَصْلَابِكُمْ (তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী) কথাটি সংযুক্ত করে এ কথা পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, পালিত পুত্রের স্ত্রীর সাথে বিবাহ হারাম নয়। **দুই বোনের** (দুধ সম্পর্কের হোক বা বংশীয় সম্পর্কের তাদের) সাথে একই সময়ে বিবাহ হারাম। তবে তাদের কোন একজনের মৃত্যুর পর অথবা তালাক্বের পর ইদ্দত শেষে অপরজনের সাথে বিয়ে জায়েয। অনুরূপ চারজন স্ত্রীর মধ্য থেকে কোন একজনকে তালাক্ব দেওয়ার পর পঞ্চমজনের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ করার অনুমতি নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তালাক্বপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত পূরণ না হয়েছে।

বিঃ দ্রষ্টব্যঃ ব্যভিচার দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হবে কি না? এ ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ উলামাগণের উক্তি হল, কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে ব্যভিচার ক'রে ফেললে, ব্যভিচারের কারণে হারাম সাব্যস্ত হবে না। অনুরূপ স্ত্রীর মা (শাশুড়ী) অথবা মেয়ের সাথে কেউ ব্যভিচার করে ফেললে, আপন স্ত্রী তার উপর হারাম হয়ে যাবে না। *(প্রমাণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ ফাতহুল ক্বাদীর)* হানাফী ও অন্য কিছু উলামাদের মত হল, ব্যভিচারে হারাম সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তবে প্রথমে উল্লিখিত মতের সমর্থন কিছু হাদীসে পাওয়া যায়।

وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (٢٣)

ভাগিনেয়ীগণ, দুগ্ধ-মাতাগণ, দুগ্ধ-ভগিনীগণ, শ্বাশুড়ীগণ ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে, তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যাগণ, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের (কন্যাদের মাতার) সাথে সহবাস না হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের (বিবাহে) কোন দোষ নেই। আর তোমাদের জন্য তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে (হারাম করা হয়েছে। হারাম করা হয়েছে) দুই ভগিনীকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা গত হয়ে গেছে, তা (ধর্তব্য নয়)। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।